ভেতরে

আঁতাতের জালে শাসকশ্রেণীর সমস্ত পার্টি ... ২
... রাজ্য জুড়ে ব্লক ডেপুটেশন ... ৩
নয়া উদারবাদের সংকট ও ... চ্যালেঞ্জ ... ৪
পুঁজির জন্য দৌড়াদৌড়ি ৫
'বাংলাদেশী' অতিকথা ও আসামের হিংসাত্মক ঘটনাবলী ... ৬
পাটনায় পরিবর্তন সমাবেশের আহ্বান ও ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৯ সংখ্যা ৪১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৫ নভেম্বর ২০১২

"নয়া ভারত, নয়া বিহার" শ্লোগান তুলে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের আহ্বানে

পাটনা গান্ধী ময়দান সমাবেশে

সমস্ত রেকর্ড ভাঙ্গা জনস্রোত

পাটনার গান্ধী ময়দানে "নয়া ভারত, নয়া বিহার" শ্লোগান তুলে ৯ নভেম্বর ২০১২ সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বিহার রাজ্য কমিটি বিশাল "পরিবর্তন সমাবেশ" সংগঠিত করে। এই সমাবেশ ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী শক্তিগুলোর সমাবেশ। এটা রাজ্যের তামাম মেহনতী মানুষের মনে বিকাশ ও পরিবর্তনের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলার সমাবেশ ছিল। সেইজন্য এই সমাবেশে সেইসব স্তরের অংশগ্রহণ ব্যাপক পরিমাণে ছিল, যাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অনেক প্রতিশ্রুতি থাকলেও আজ নিজেদের বঞ্চিত ও প্রতারিত মনে করছেন। দলিত, মহিলা ও অতি পশ্চাদপদদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ এই সমাবেশে ঘটেছে। সমাবেশ এই ঐতিহাসিক তথ্যকেও প্রমাণ করেছে যে বুর্জোয়া বিধানসভার ভেতরে বিপ্লবী পার্টির প্রতিনিধিরা থাক বা না থাক, বিপ্লবী বিরোধী পক্ষ ময়দানে, রাস্তায় এবং ক্ষেত-খামারে অবশ্যই হাজির থাকে।

দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন একদিন আগে, অর্থাৎ ৮ নভেম্বর দিনের বেলাতেই পৌঁছতে শুরু করেছিল এবং সন্ধ্যা হতে হতে ময়দানের প্যাণ্ডেল পুরো ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। রাতভর জনতার আসা চলতে থাকে এবং ৯ তারিখ ১০টা বাজতে গান্ধী ময়দান লাল ঝাণ্ডা ও ব্যানারে ঢাকা পড়ে যায়। ৪ নভেম্বর শাসক জে ডি (ইউ)-র অধিকার সমাবেশ হয়েছিল, আর তারপর হল সি পি আই (এম এল)-এর পরিবর্তন জমায়েত—তাই পাটনার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই

সাতের পাতায় দেখুন

বিহারে পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে পাটনার গান্ধী ময়দান সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।

দুবরাজপুর—তৃণমূলী জমানার

দ্বিতীয় সিঙ্গুর !

আবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। এবার বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে। লোবা গ্রামে। মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে। জমির ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থান প্রভৃতির দাবিতে দীর্ঘ ২০০৬ সাল থেকে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর নির্বিচারে চলল গুলি। চলল লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস। ৬ নভেম্বরের কাকভোরে লোবা গ্রামে পুলিশী গুলি চালনার ঘটনার তদন্ত করতে এবং আহত গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের তরফ থেকে ১০ সদস্যবিশিষ্ট এক তদন্তকারী দল ৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পালের নেতৃত্বে এই দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য অভিজিৎ মজুমদার, এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্যবৃন্দ মলয় তিওয়ারি ও সুরন্দির সিং, বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক সুবোধ রুজ, জেলা কমিটির সদস্য গোপাল ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন প্রদ্যোত মুখার্জী ও রবীন ব্যানার্জী।

ঘটনাস্থল বাবুপুরের ধর্ণা মঞ্চে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র সভাপতি ফেলারাম মণ্ডল সহ কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিস্তারিত কথাবার্তা চালানো হয়। গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গুলি, টিয়ারগ্যাস বা লাঠি চালানোর ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী পুরোপুরি অস্বীকার করলেও নানা তদন্ত রিপোর্ট ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া খবরাখবর থেকে এটা প্রমাণিত যে সরকার ও প্রশাসনের উচ্চতর স্তর এবং শিল্পমন্ত্রীর কাছ থেকেই পুলিশী অভিযান চালানোর নির্দেশ আসে। প্রতিনিধিদলকে দেখানো ব্যবহৃত কার্তুজের খোল,

আটের পাতায় দেখুন

তেহট্টে পুলিশের লাঠি গুলি চালিয়ে হতাহতের তীব্র নিন্দা ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

দুবরাজপুরের লোবা গ্রামে কয়লা মাফিয়া বেঙ্গল এমটার হয়ে রাজ্য পুলিশ ৫ জনকে গুলিবিদ্ধ করেছিল। সেই ক্ষত শুকোতে না শুকোতে গত ১৪ নভেম্বর নদীয়ার তেহট্ট থানার হাউলিয়া গ্রামে নির্বিচারে লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস চালালো পুলিশ। এস ডি পি ও শৈলেন সাউ-এর নেতৃত্বে গুলি চালায় মহসিন সেখ ও ওয়াহিদ সেখ নামে ২ পুলিশ কনস্টেবল। গুলিতে অশোক সেন নামে এক গ্রামবাসীর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং আরও চারজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। তেহট্ট থানার নাতনা, গোপালপুর, হাউলিয়া অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে পুলিশ। গত ৪ দিন ধরে পুলিশের উপস্থিতিতে তেহট্ট থানায় গ্রামবাসীদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হওয়ার পরে ঘটনার দিন সকালে হাউলিয়া গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজোর অনুমতি নিয়ে বৈঠকে বসার কথা ছিল পুলিশের। গ্রামবাসীরা থানার পাশে ব্যাপক সংখ্যায় জমায়েত হয়েছিল। পূজোর অনুমতি না মেলায় উত্তেজনা ছড়ায় এবং তারপরেই পুলিশের লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস চালায়। 'মা-মাটি-মানুষে'র সরকার কি 'মা-মাটি-পুলিশে'র সরকারে পরিণত হচ্ছে? ঘটনার দিন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের ডাকে ১২ ঘন্টা তেহট্ট ব্লক জুড়ে বন্‌ধ পালন করা হয়, ১৫ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ।

সম্পাদকীয়

‘পরিবর্তন’ স্পষ্ট হচ্ছে

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের পর বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া। বড়জোড়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত জমি মালিকরা প্রতিকারের দাবি জানাতে গেলে নিশ্চয়তা মেলেনি, উল্টে পুলিশের লাঠির বাড়ি খেতে হয়েছে। তাদের অসন্তোষ নতুন নয়, জমির অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ধূমায়িত ক্ষোভ ২০০৬ সালের পর থেকে। জমি দেওয়ার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের আর্থিক মূল্যের সমস্যার এক ধাপ মীমাংসা হলেও ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আরও যে বৃহত্তর প্যাকেজের দাবি ছিল সেগুলো এতকাল অবহেলার শিকার হওয়ার ফলে সেখানে গণক্ষোভ ফেটে পড়েছে। দুবরাজপুরের তোলপাড় করা গণপ্রতিবাদ-প্রতিরোধ বড়জোড়ার জমিদাতাদের প্রতিবাদের জ্বালামুখ খুলে দিতে বাহ্যিক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন সিঙ্গুরের পর ঘটেছিল নন্দীগ্রাম, তেমনি এখন নাছোড় হয়ে ওঠার নজীর স্থাপন করছে দুবরাজপুরের পর বড়জোড়া। বড়জোড়ায় অভিযোগের তীর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড’ এবং ‘ট্রান্স দামোদর কোল মাইনিং প্রজেক্ট’-এর বিরুদ্ধে। সেখানে রয়েছে চাষের জমি সংলগ্ন উৎকৃষ্ট কয়লার খনি, সেখান থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য ৯টি মৌজার ৬৯৪ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। আর এপর্যন্ত সেখানে জমি অধিগৃহীত হয়েছে ২৮২ একর, বছরখানেক আগে থাকতে কয়লা উত্তোলন শুরুও হয়ে গেছে। কিন্তু জমি মালিকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ প্যাকেজ এখনও পূরিত হয়নি। খনি তৈরীর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় সংলগ্ন জমি ও বাড়িগুলিতে ফাটল ধরা, খনি থেকে তোলা মাটি ও খনির জলের সংস্পর্শে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং জলস্তর নেমে যাওয়ায় পানীয় জলের তীব্র সংকট—এইসমস্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিকারের দাবি রয়েছে।

দুবরাজপুর, বড়জোড়ার জটগুলোর সূত্রপাত বিগত বামফ্রন্ট আমলে হলেও শাসকের উত্তরাধিকারি হিসেবে তৃণমূল সরকার ঐসমস্ত সমস্যার নিরসনের দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু রাজ্য সরকার তার দায়বদ্ধতা আন্তরিকভাবে পালন করছে না। বরং কোথাও পরোক্ষে জুলুমবাজীকে মদত দিচ্ছে, নয়তো উপেক্ষার মনোভাব দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ‘সরকারি-বেসরকারি বা যৌথ অংশীদারির জন্য কোনরকম জমি অধিগ্রহণ করবে না’ বলে কেবল বহিরঙ্গে খুব নীতিগত অবস্থানের সদাশয়তা দেখাচ্ছে, কিন্তু তার অন্তরালে অনেক অনাচার করে চলেছে, বহু অন্যায়-অপরাধকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে চলছে। দুবরাজপুরে ধরা পড়ে গেছে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর নেপথ্য কালো হাত, বড়জোড়ার ক্ষেত্রে উন্মোচিত হচ্ছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বহীনতার পরিচয়। তিনিই সেখানে গিয়েছিলেন মাত্র ছয়মাস আগে খনিমুখের উদ্বোধন করতে। তখন স্থানীয়বাসীদের মুখ থেকে দাবিসমূহ শুনেছিলেন, ক্ষোভেরও আঁচ পেয়েছিলেন। তবে ‘স্থানীয় প্রশাসন দেখবে’ বলে তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। তিনি আছেন উদ্বোধনে, উদ্বেগ দূরীকরণে নয়। উল্টে প্রতিবাদীরা পুলিশী দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণ থেকে বলে দিচ্ছেন সমাধানের জন্য যা যা করণীয় তার নির্দেশ যাচ্ছে জেলা ও ব্লক প্রশাসনে, আর জেলাশাসকের এবং ব্লক উন্নয়নের অফিস বলছে দাবি মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন নির্দেশ নেই। কার্যত বরাবরকার এক প্রথাগত নিস্পৃহতা প্রদর্শনের অচলায়তন প্রকটভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। একদা বিরোধী দলের আগমার্কা ‘অগ্নিকন্যা’ নেত্রী এখন অধিষ্ঠান করছেন শাসনক্ষমতার মুখ্য কুর্সীতে। তিনি তাই নিজস্ব স্টাইলে এখন সেই বিগত দিনের ভাবমূর্তির রেশ ঝেড়ে ফেলে শাসকশ্রেণীর আস্থাভাজন হতে প্রয়াসী। বিদ্রোহের ঘটনাস্থলে গিয়ে দাঁড়ানোর দিনগুলো তিনি আর ধরে রাখার পক্ষপাতি নন, ওসবের রাজনৈতিক প্রয়োজন তাঁর কাছে আর নেই, তিনি এখন কেবলই শাসক, ঘোর বিনিয়োগমুখী, এমনকি বিনোদনসর্বস্ব চলচ্চিত্রে বিনিয়োগের বাসনায়ও তাঁর বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। তিনি কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরানো সিঙ্গুরে যাওয়া কবেই ছেড়ে দিয়েছেন, দুবরাজপুর-বড়জোড়াতেও যাচ্ছেন না, যাবেন না। তাঁর গতিবিধি এখন গুণীজন সম্বর্ধনার আসরে, শিল্পপতিদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলনে, ঝলমলে তারকা সমাবেশে। এই ‘পরিবর্তন’ বেশ স্পষ্ট।

রাজনীতি ও বৃহৎ পুঁজির দুর্নীতিগ্রস্ত আঁতাতের জালে শাসকশ্রেণীর সমস্ত পার্টি

বিজেপির সভাপতি নীতিন গড়করি এখন সন্দেহজনক ব্যবসায়ী স্বার্থের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জালের মাথা হিসাবে উন্মোচিত হয়েছেন। গড়করির চিনি ও বিদ্যুৎ কোম্পানীতে বিনিয়োগকারী হিসাবে দেখানো ১৮টা কোম্পানীর ঠিকানা হল ভুয়ো ও অস্তিত্বহীন এবং এর মধ্যে অনেক কোম্পানী রয়েছে গড়করির ব্যক্তিগত কর্মচারী (যেমন তার গাড়িচালক ও জোতিষী)-র নামে। এটাও দেখা গেল যে জাতীয় স্তরে প্রধান বিরোধী পার্টির সভাপতি একই সঙ্গে কালো টাকাকে সাদা করে যারা সেই সমস্ত কোম্পানী সাম্রাজ্যের অধিপতিও বটে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (যারা বিজেপির সভাপতি হিসাবে গড়করিকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছিল) ও বিজেপি গড়করির সমর্থনে দাঁড়ায়, যদিও দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁর সভাপতি হওয়াটা সন্দেহের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কংগ্রেস যেভাবে বঢরার সমর্থনে দাঁড়ায় ঠিক সেইভাবেই এল কে আদবানী বলেন যে গড়করির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে না, বরং তো নিছকই ‘‘ব্যবসার মাপকাঠি’’ সংক্রান্ত এক বিতর্কিত মামলা। গেরুয়া ‘বাবা’ রামদেব, যিনি এখন গুজরাটে বিজেপির হয়ে প্রচার চালাচ্ছেন, তিনি নিজেই কালো টাকার বিরুদ্ধে তাঁর তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের ফাঁপাপনাকে উন্মোচিত করেছেন এই কথার মধ্য দিয়ে যে গড়করির দুর্নীতি বলে যা বলা হচ্ছে তা নিছকই ‘টেকনিক্যাল’ প্রকৃতির, প্রকৃত কোন দুর্নীতি নয়।

অবশ্য দুর্নীতি থেকে মুক্ত এক ‘ভিন্ন ধরনের’ পার্টি হিসাবে বিজেপি নিজের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চেয়েছিল তা অনেক দিন আগেই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। এন ডি এ সরকারের সময়কালে বিজেপির আর একজন সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ অস্ত্রচুক্তির বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার সময়ে ক্যামেরাতে ধরা পড়েন। বঙ্গারু থেকে গড়করি পর্যন্ত পৌঁছানোটা হল সন্দেহজনক অনুদান গ্রহণ থেকে রাজনীতি ও বৃহৎ পুঁজির এক চক্রকে পরিচালনা করা পর্যন্ত। দুর্নীতি এবং পার্টি হিসাবে বিজেপির বিবর্তনেরই এক কাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ ব্যবসায়ী, বৃহৎ কর্পোরেট ও রাজনীতির চক্রটি নয়া উদারনৈতিক ভারতে দুর্নীতিরাজের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রীসভার সর্বশেষ রদবদলের ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে যে কত গভীরে এই চক্র কাজ করে চলেছে। জয়পাল রেড্ডিকে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক থেকে ‘শাস্তিমূলক বদলি’ হিসাবে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকে স্থানান্তকরণ স্পষ্টতই রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থেই ঘটেছে।

রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীর সি ই ও মুকেশ আম্বানী পরপর পাঁচ বছর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ভারতীয় হিসাবে উঠে এসেছে। এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শাসক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া। সরকারের ওপর রিলায়েন্সের প্রভাব এমনই যে তারা বারবার তুলনামূলকভাবে স্বাধীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে সরিয়ে আম্বানীর পছন্দের লোককে মন্ত্রী করতে পেরেছে। ২০০৬ সালে মণিশঙ্কর আইয়ারকে সরিয়ে মুরলী দেওয়াকে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী করা হয়েছিল, এখন ২০১২ সালে জয়পাল রেড্ডিকে সরিয়ে মুকেশ আম্বানী পুনরায় এই ‘কৃতিত্ব’-এর অধিকারী হয়। জয়পাল রেড্ডি রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠী ও ব্রিটিশ তেল কোম্পানী বি পি-র মধ্যকার চুক্তিকে অনুমোদন দেননি; কে জি বেসিন গ্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করার জন্য রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীকে দায়ী করেন (ক্যাগ এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের ঘটনাকে প্রকাশ করে) এবং রিলায়েন্স নিয়ে আর একটা ক্যাগ রিপোর্টের জন্য বলেন; ২০১৪ সালের নির্ধারিত তারিখের আগে গ্যাসের মূল্য সংশোধন করার জন্য রিলায়েন্সের দাবিকে আটকে দেন; এবং রিলায়েন্সের ঘনিষ্ঠ দেওরার সময়কালে নিয়োগ হওয়া আমলাদের সরিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস খোলাখুলিভাবে রিলায়েন্সের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং এখন মনমোহন সিং রিলায়েন্স গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক স্বার্থকে রক্ষা করতে রেড্ডিকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

উদারনৈতিক নীতির যে জমানা রাজনীতি ও বৃহৎ পুঁজির অশুভ আঁতাত ও দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত ঘটায় তার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এক প্রকৃত রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে উঠতে পারে। এই অশুভ আঁতাতের জালেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে শাসক পার্টি কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী পার্টি বিজেপি। বেশিরভাগ আঞ্চলিক পার্টিগুলোও এই আঁতাতের পাঁকে গভীরভাবে ডুবে আছে এবং তারা নিজেদের লাভের জন্য কংগ্রেস বা বিজেপির সঙ্গে থাকে। এই ধরনের শক্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন বিকল্প গড়ে উঠতে পারে না। যে কমিউনিস্ট আন্দোলন কর্পোরেট লুট ও দুর্নীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করছে, সেই আন্দোলনকেই এক বিপ্লবী জাতীয় রাজনৈতিক বীক্ষা ও বিকল্পের অভিমুখে এগোতে কেন্দ্র শক্তি হিসাবে উঠে আসতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৩০ অক্টোবর ২০১২)

১০ নভেম্বর হুগলীতে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন

গত অক্টোবর মাসের শুরুতে হুগলীর বৈঁচীতে অনুষ্ঠিত আয়ালা রাজ্য কাউন্সিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আসন্ন ফসল তোলা ও রবি মরশুমে সংগঠিত করা হবে কৃষিমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে এ আই এ এল এ হুগলী জেলা কমিটির বিশেষ বৈঠক পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় পোলবা-দাদপুরের গোস্বামী-পালিপাড়া পার্টি অফিসে।

স্থির হয় যে ১০ নভেম্বর জেলাজুড়ে সংগঠিত হবে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন। কৃষিক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ভ্রেগার মজুরি বৃদ্ধি ও সাত দিনের মধ্যে মজুরি প্রদানের দাবিটিও তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই আন্দোলনকে সংগঠিত করতে কয়েকটি বিশেষ এলাকায় বৈঠকেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। পোস্টার ছাপানো হয় ও বড় আকারে পোস্টারিং করা হয়। কেবলমাত্র ১০ নভেম্বরকে ধরে বৈঁচী, সাটিখান, দাদপুর, মহীপালপুর এবং ৮ এবং ১০ নভেম্বরের কর্মসূচীকে ধরেও একত্রভাবে অন্যান্য অঞ্চলেও অটো প্রচার কর্মসূচী সংগঠিত হয়।

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে ১০ নভেম্বরের কর্মসূচী কৃষিমজুরদের মধ্যে ভালোই উৎসাহ সৃষ্টি করে। আমাদের প্রচার কর্মসূচীতে উৎসাহিত হয়ে পাণ্ডুয়ার বৈঁচীর আলিপুর, বেলুন, ধামাসিন, দেপাড়া, দাদপুরের কিছু গ্রামে কিছু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগও লক্ষ্য করা গেল।

১০ নভেম্বরের সফল কর্মসূচীর পর মজুরি বৃদ্ধি ঘটে পাণ্ডুয়ার সাঁচিতারা, নান্দীনগ্রাম, ইলছোবা গ্রামে, পোলবা-দাদপুরের গোস্বামী-মালিপাড়ার তালচিনান, সানিহাটী, দাঁতরা গ্রামে। এর মধ্যে সাঁচিতারা, ইলছোবা, তালচিনান, সানিহাটী ও দাঁতরা গ্রামে ধর্মঘটী কৃষিমজুররা ১০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তবে পাণ্ডুয়ায় নান্দীনগ্রামে মজুরি বৃদ্ধি ঘটে ২০ টাকা। ইলছোবাতে তৃণমূল আশ্রিত ধনী কৃষকদের একাংশ দাবি না মানলেও এদের থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এখনো আন্দোলন চলছে। ভূষালী গ্রামেও আন্দোলন চলছে। উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সংগঠিত হয় দাদপুরের সাটিথানে। এখানে কয়েকশো কৃষিমজুর সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দাদপুরের শ্রীরামপুরেও আন্দোলন চলছে ১০ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার। এখানে কৃষিমজুররা প্রতিদিন মিছিল সংগঠিত করছেন, ব্লক স্তরে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের কাছে গণস্বাক্ষর সহ ডেপুটেশন সংগঠিত করেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্বস্তরে উঠে এসেছেন আদিবাসীদের শিক্ষিত যুবক কমরেডরা। উল্লেখ্য, বৈঁচীর অলিপুরে আমাদের প্রচার কর্মসূচীতে উৎসাহিত কৃষিমজুররা সংগঠনের সাথে নতুনভাবে সংযোগ গড়ে তুলে ধর্মঘটে যেতে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। ধনেখালি ও বলাগড়ের গ্রামে ধান কাটার সময়ে মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মঘট গড়ে তুলতে বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিস্তারিত রিপোর্ট পরবর্তীতে।

দুবরাজপুরে পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

দুবরাজপুরে পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ঝিল্লী অঞ্চলে নোনাডাঙা বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভসভা করা হয়। পার্টির ঝিল্লী-খাসপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য হায়দার সেখ, জুল এবং এ আই এস এ-র জেলা নেতা অরিত্র। সভা সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী যুব এ্যাসোসিয়েশনের সংগঠক হাসান আলি। শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় পার্টির দলীয় কার্যালয় থেকে, তারপর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল শিলিগুড়ি কলেজের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিল থেকে দাবি ওঠে দুবরাজপুরে পুলিশের গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে, আহত ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির জেলা কমিটির সদস্য পবিত্র সিংহ, অজিত সিংহ, শরৎ সিংহ, মোজাম্মেল হক ও অপু চতুর্বেদী। জলপাইগুড়ি জেলা শহরের কদমতলা মোড়ে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী, জেলা কমিটি সদস্য বিজন সরকার, সুভাষ দত্ত, মুকুল চক্রবর্তী ও প্রদীপ গোস্বামী। ধিক্কার জানাতে এ আই এস এ-র উদ্যোগে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে এক বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

৮ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হল ব্লক ডেপুটেশন

কৃষক ও কৃষিমজুরদের জীবিন-জীবিকার অধিকারগুলোকে আদায় করতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ৮ নভেম্বর রাজ্যজুড়েই ব্লকগুলোতে সংগঠিত করা হবে বিডিও ডেপুটেশন কর্মসূচী। কেবলমাত্র কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী না করে এই ডেপুটেশন কর্মসূচীকে সংঘর্ষমূলক চেহারা প্রদানের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। মূল দাবিগুলো ছিল—রাজ্যজুড়ে কৃষক আত্মহত্যা রুখতে সরকারি ব্যর্থতার প্রতিবাদ ও আত্মহত্যাকারী কৃষক পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ফসলের ন্যায্যমূল্য; সার-বীজ-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, নেগা-তে ৭ দিনের মধ্যে মজুরি প্রদান সহ কাজের ব্যবস্থা, বি পি এল এবং রেশন কার্ড, খাস জমির বিলিবন্টন, বর্গা ও পাট্টা উচ্ছেদ রোধ করা ইত্যাদি সহ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ, দুবরাজপুরে পুলিশের গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি ইত্যাদি। জেলায় জেলায় এই কর্মসূচীকে সফল করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গৃহীত হয়। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ব্যাপক কৃষক জনগণ।

নদীয়া

নদীয়ার ৪টি ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। ধুবুলিয়ায় বিডিও এবং বি এল এ্যাণ্ড এল আর ও দুটি দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং এই কর্মসূচীতে প্রায় ৪০০ মানুষ উপস্থিত ছিল। জেলা সম্পাদক সুবিমল সেনগুপ্তর নেতৃত্বে বিডিও দপ্তরে এবং জেলা কমিটির সদস্য আনছারুল হকের নেতৃত্বে বি এল এণ্ড এল আরও দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নাকাশিপাড়া ব্লকে কাজল দত্তগুপ্ত, সেলিম মণ্ডল এবং ধনঞ্জয় গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে প্রায় ১০০ লোকের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন হয়। কালিগঞ্জ ব্লকে আলতাফ হোসেন ও উমা রায়ের নেতৃত্বে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন পালন করা হয়। চাকদহ ব্লকে অনিল কর্মকারের নেতৃত্বে বেশ কিছু মানুষের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা

বসিরহাট ১ নং ব্লক অফিসে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে যুব, মহিলা, কৃষিমজুর, নির্মাণ কর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বসিরহাট শহরের খাদ্যদপ্তরের সামনে জমা হন এবং মিছিল করে ব্লক অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রায় ২০০ মানুষের এই মিছিল ছিল সুসজ্জিত, লাল পতাকায় ঢাকা ও দৃপ্ত শ্লোগানে মুখরিত। দুবরাজপুরের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ছিল সবার আগে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন উত্তর ২৪ পরগণা ও বসিরহাটের পার্টির জেলা নেতৃবৃন্দ দেবব্রত বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, আবেশ মাইতি, নারায়ণ রায়, সুনেত্রা সেনগুপ্ত সহ আবু ফসর আলজামান, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, তপতী বিশ্বাস। ব্লক অফিসে গিয়ে মিছিলটি পৌঁছানোর পর বাইরে চলে দৃপ্ত শ্লোগানের পাশাপাশি বক্তৃতা, আর দেবব্রত বিশ্বাস, সুনেত্রা সেনগুপ্ত, আলি ফসর আলজামান, নুর ইসলাম মোল্লা, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, আহাল আলি ও হাসানুজ্জামান মোল্লারা যান বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে। স্মারকলিপিতে ৮ দফা যে দাবি পেশ করা হয়েছিল সেগুলো হল—অবিলম্বে বি পি এল কার্ড বিলি করতে হবে, বাস্তুহীন ও ভূমিহীন কৃষকদের বাস্তুজমি ও কৃষি জমি দিতে হবে, দণ্ডিরহাট থেকে মাটনিয়া নতুন হাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও ব্লকের অন্যান্য রাস্তা সংস্কার, ব্লকের সর্বত্র আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে, ন্যায্য দামে ধান-পাট-আলু ক্রয় এবং সার-বীজ-কীটনাশক বিক্রয় সুনিশ্চিত করতে হবে, এম জি এন আর ই জি এ প্রকল্পে গতি বৃদ্ধি ও দ্রুত মজুরি প্রদান করতে হবে এবং এই প্রকল্পের দুর্নীতিতে যুক্ত সকলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই সব দাবির প্রত্যুত্তরে বিডিও জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে খোঁজ নিতে হবে। ব্লক দপ্তরের সামনে বিডিও-এর সঙ্গে কথোপকথনের সারমর্ম সবাইকে জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও লড়াইয়ের অঙ্গীকার নিয়ে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জেলার হাবরা ২ নং ব্লক দপ্তরে ৭ দফা দাবিতে গণবিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। কবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধিদল বিডিও সাক্ষাত করেন। দুপুর থেকেই ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক-ক্ষেতমজুর মহিলারা দলে দলে যোগ দেন। বিক্ষোভসভায় পার্টির জেলা সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, নেত্রী অর্চনা ঘটক, ব্লক সম্পাদক অজয় বসাক ভাষণ দেন। বাস্তু জমি, বৃদ্ধ ভাতা, নেগা কাজ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশাসনের অবহেলা নিয়ে বিক্ষোভে চরমসীমা দেওয়া হয়। ব্লকের ৩৭৩টি বাস্তুহীন পরিবারের কোন সমাধান আজও কেন হল না তার কৈফিয়ৎ দাবি করা হয়। গাইঘাটা ব্লকেও গণবিক্ষোভ ও ডেপুটেশন হয়। কৃষক নেতা কৃষ্ণ প্রামাণিক, আঞ্চলিক নেতা নন্দদুলাল দাস, হিমাংশু বিশ্বাস, চম্পা প্রামাণিক সহ অন্যান্যরা বিক্ষোভ-ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। রাজ্যস্তরের দাবি ছাড়াও চালুন্দি খাল বেদখল রুখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর ব্লক-১ ও বজবজ ব্লক-১-এ গণডেপুটেশন সংগঠিত হয়। বিষ্ণুপুর ব্লক-১-এর অধীন বাখরাহাট বাজার থেকে মিছিল সহকারে বিবিরহাট মোড়ে ব্লক অফিসের সামনে মিছিল সমাপ্তি হয়। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা কমিটি সদস্য দিলীপ পাল, লোকাল কমিটির সদস্য দাউদ আলি মণ্ডল ও ২ জন মহিলা সদস্য। বজবজ ব্লক-১ নিশ্চিন্তপুর পঞ্চায়েতের অধীন রঞ্জিত মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল যত এগোতে থাকে ততই মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শতাধিক মানুষ মিছিল সহকারে ব্লক অফিসে হাজির হন। ৪ জনের প্রতিনিধিদল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সাক্ষাত করতে যান। বাইরে সমবেত মানুষের সামনে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য লক্ষ্মী অধিকারী ও কাজল দত্ত। এই মিছিলে অংশগ্রহণ ভালো ছিল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার, লোকাল কমিটির সদস্য আশুতোষ মালিক, মীনা করণ, দিলীপ দাস। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক না থেকে যুগ্ম আধিকারিক থাকায় প্রতিনিধিদল প্রতিবাদ জানান। এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হয়। ১০০ দিনের কাজের পরিকল্পনা তৈরী করা অসুবিধা আছে বলে জানান। তবে সংগঠনের তরফ থেকে কোন পরিকল্পনার রূপ দেওয়া যাবে এমন খবর দিতে পারলেই তিনি আরও কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বি পি এল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তপশিলি প্রধান এলাকায় শংসাপত্র প্রদান নিয়ে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তলব করেন। ২০১১-১২-এ পর্যন্ত ৭০০ জনের দরখাস্ত জমা পড়েছে তার মধ্যে ৩৫০টি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানানো হয় যে সময়ে নথি দেওয়া সত্ত্বেও শংসাপত্র পাইনি। তিনি ১ দিনের খোঁজ নিয়ে শংসাপত্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। আগামী যত দরখাস্ত জমা পড়বে তা দ্রুততার সাথে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

হুগলী

হুগলী জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিডিও ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয়। বিডিও-র কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয় ন্যূনতম মজুরির সরকারি ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি না পাওয়ার বিষয়ে বিডিও কার্যকরি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন। সারের কালোবাজারি ও মূল্যবৃদ্ধি, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, যার ফলে গরিব কৃষকেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা রোধ করার জন্য দাবি তোলা হয়। কর্মসূচী চলাকালীন বিডিও-র কাছে যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তাতে গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের গণতন্ত্রের ওপর হামলা রুখতে প্রশাসনকে সক্রিয় হওয়ার দাবি থাকে। রাস্তাঘাট থেকে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিডিও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পোলবা ব্লকে জেলা কমিটি সদস্য সাধন মাল ও চৈতালী সেনের নেতৃত্বে ৪৫০ জন; পাণ্ডুয়া ব্লকে নিরঞ্জন বাগ, শুভাশিষ চ্যাটার্জী ও মুকুল কুমারের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন; বলাগড় ব্লকে জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার ও শোভা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ১৫০ জন এবং ধনেখালি ব্লকে সজল অধিকারী ও জয়ন্ত অধিকারীর নেতৃত্বে শতাধিক গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ মেহনতী মানুষ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচীতে দুবরাজপুরের লোবা গ্রামে পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। দুবরাজপুরের ঘটনার প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর নির্মাণ শ্রমিক ও পার্টি সদস্যরা যৌথভাবে চুঁচুড়ার বুকে মিছিল সংগঠিত করে। পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিল পাণ্ডুয়াটুলিতে এসে শেষ হয়। কোন্নগর-হিন্দমোটর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যেবেলায় লাল পতাকায় সুসজ্জিত সাইকেল মিছিল বিস্তীর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। ৭ নভেম্বর সকালে চুঁচুড়া দলীয় কার্যালয়ে মর্যাদার সঙ্গে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান পার্টি সদস্য মানিক দাশগুপ্ত। শহীদ বেদীতে মাল্যদান, শহীদ স্মরণে নীরবতা পালনের পর বর্তমান সময়ে নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এলাকা কমিটির সম্পাদক স্বপন গুহ, ব্যোমকেশ ব্যানার্জী ও কল্যাণ সেন।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকে ১০০ দিনের কাজ, বাস্তু জমির পাট্টা ইত্যাদি দাবি সহ দুবরাজপুরে পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী সংগঠিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরে ১০০ দিনের কাজে মজুরি না পাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচী নেওয়া হয় নয়াগ্রাম ব্লকে।

হাওড়া

বাগনান ১ ও ২ নং ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন (বিডিও) দপ্তরে পার্টির ডাকে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে তিন শতাধিকের বেশী দরিদ্র কৃষক, ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ মেহনতী মানুষরা উপস্থিত ছিলেন, বিশেষত শ্রমজীবী মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ২টি ব্লকের ৪টি অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামে বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান প্রচার করা হয়, অটোগাড়ীতে এলাকাজুড়ে প্রচার চলে। ৮ নভেম্বর খাদিনান মোড় থেকে দীর্ঘ মিছিল করে ১ নং ব্লকে শ্রমজীবী মানুষরা উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান, বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির বিভিন্ন সদস্য ও সংগঠকবৃন্দ। দিলীপ দে, নবীন সামন্ত, স্বপন খাঁ, বিজলী মালিক ও চিত্রা মাইতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বিডিও-র সঙ্গে সাক্ষাত করে ডেপুটেশন দেন। ঘোড়াঘাটা রেল স্টেশন থেকে ম্যাটাডোর, মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যান ইত্যাদি যানবাহনে করে প্রচার করতে ২ নং ব্লকে বিডিও দপ্তরে উপস্থিত হন গ্রামীণ মেহনতী মানুষরা, বিক্ষোভে সামিল হন। জেলা কমিটির সদস্য সনাতন মনি, কল্যাণী গোস্বামী, স্থানীয় সংগঠক শেখ গুলজার আলী, মুর্শিদা বেগম, সাহানারা বেগম, সাজাহান আলিরা বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রভাত কুমার, কল্যাণী গোস্বামী, সনাতন মনি ও জেলা সম্পাদক দেবব্রত ভক্ত।

বর্ধমান

বর্ধমান জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় কালনা ১ নং, কালনা ২ নং, মন্তেশ্বর, ভাতার, বর্ধমান সদর ২ নং ও পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকে পথ অবরোধ করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন কালনা ১ নং ব্লকে সি পি আই (এম এল) জেলা কমিটি সদস্য অশোক চৌধুরী, কালনা ২ নং ব্লকে পার্টির জেলা সম্পাদক সলিল দত্ত সহ স্থানীয় নেতা হাফিজুর রহমান, মন্তেশ্বরে আনসারুল আমন মণ্ডল, ভাতারে জেলা কমিটি সদস্য অন্নদা প্রসাদ ভট্টাচার্য ও সত্য নারায়ণ বিশ্বাস, বর্ধমান সদরে জেলা কমিটি সদস্য শ্রীকান্ত রাণা এবং পূর্বস্থলী ১-এ জিয়াদুল ও পূর্বস্থলী ২-এ জেলা কমিটি সদস্য সজল পাল ও বিনয় মণ্ডল। এর আগে ২ নভেম্বর মেমারী ২ নং ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল জেলা কমিটি সদস্য মনসুর মণ্ডলের নেতৃত্বে।

বীরভূম

বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ ও নানুর ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন রামপুরহাটে জেলা কমিটি সদস্য রতন প্রামাণিক ও নানুরে জেলা সম্পাদক সুবোধ রুজ।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন নবম পার্টি কংগ্রেসের শ্লোগান

১। রাজনীতি আর বৃহৎ পুঁজির অশুভ আঁতাত ধ্বংস করুন, শক্তিশালী করে তুলুন জনগণের রাজনীতিকে!

২। আমেরিকা ও বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানার স্বার্থবাহী নীতিসমূহ প্রত্যাখ্যান করুন, দেশ ও জনগণের কল্যাণকর নীতির জন্য সংগ্রাম করুন!

৩। কর্পোরেট লুণ্ঠন থেকে প্রকৃতি ও তার সম্পদকে রক্ষা করুন, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন!

৪। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং গণতন্ত্রের ওপর কর্পোরেট কব্জা প্রতিহত করুন—দেশকে বাঁচান, মানুষের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৫। জমি, জীবিকা ও স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের মোকাবিলা করুন—গণতন্ত্র ও মানুষের মর্যাদা রক্ষা করুন!

৬। সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক হামলা প্রতিহত করুন—মহিলা ও দলিতদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করুন!

৭। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন প্রতিহত করুন—সাম্প্রদায়িক নরঘাতকদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হোন!

৮। অপারেশন গ্রীণ হান্টের নামে আদিবাসীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন! আদিবাসীদের জমি, জঙ্গল ও আত্মপরিচয়ের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৯। জনগণের আন্দোলন তীব্রতর করতে সি পি আই (এম এল)-কে শক্তিশালী করুন, সংগ্রামী বাম বিকল্প গড়তে গণসংগ্রামের শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন!

১০। কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলুন! সি পি আই (এম এল)-এর আসন্ন নবম কংগ্রেস সফল করুন! রাঁচী, ২-৬ এপ্রিল ২০১৩

নয়া উদারবাদের সংকট ও গণআন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জ

*(এই বিষয়ে ইংরাজিতে **অরিন্দম সেন**-এর লেখা একটি পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদকগুলী, দেশব্রতী)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের রূপে সাম্রাজ্যবাদ

গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঋণের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলল। সার্বিক একচেটিয়াকরণ, পণ্যের রপ্তানিকে ছাপিয়ে পুঁজির রপ্তানি, লগ্নি পুঁজির মোড়লতন্ত্রের উত্থানের মত বৈশিষ্ট্য সহ এক পরগাছা ও মুমূর্ষু ব্যবস্থারূপে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গেই তা গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে পৌঁছল। আর তখন অর্থ পুঁজির লগ্নি পুঁজিতে রূপান্তরণ ঘটল এবং তা আরও প্রতিপত্তিশালী অবস্থান অর্জন করল ঃ

''সাম্রাজ্যবাদ, লগ্নি পুঁজির আধিপত্য হল পুঁজিবাদের সেই সর্বোচ্চ পর্যায় যেখানে বিচ্ছিন্নতা (''শিল্পীয় বা উৎপাদিকা পুঁজির থেকে ... অর্থ পুঁজির'') বিপুল মাত্রা অর্জন করে। অন্য যে কোন রূপের পুঁজির ওপর লগ্নি পুঁজির কর্তৃত্বের অর্থ হল উপস্বত্বজীবীদের ও লগ্নি মোড়লতন্ত্রের প্রাধান্য; এর অর্থ হল আর্থিক দিক থেকে 'শক্তিশালী' অল্প সংখ্যক রাষ্ট্রের জন্য সকলের মধ্যে কর্তৃত্বপরায়ন হয়ে ওঠা।

''... পুরনো পুঁজিবাদ থেকে নতুন পুঁজিবাদে, সাধারণভাবে পুঁজির আধিপত্য থেকে লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করছে বিংশ শতাব্দী।'' (*সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থে লেনিন)

লগ্নি পুঁজি বলতে কি বোঝায়? লেনিন বলেছেন, মূলগতভাবে এটা হল ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির সম্মিলন, আর আজ আমাদের সম্ভবত বাণিজ্যিক পুঁজিকেও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই সম্মিলনের মধ্যে আবার থেকে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্র—যাদের নিজস্ব পরিচিতি ও স্বার্থ রয়েছে----তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। লেনিন দেখিয়েছেন, আধুনিক ব্যাঙ্কগুলো অর্থের সামাজিক ক্ষমতাকে তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে এবং তারা ''এক একক যৌথ পুঁজিপতি'' হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছে। এইভাবে তারা ''শুধু সমস্ত বাণিজ্যিক ও শিল্পীয় ক্রিয়াকলাপগুলোকেই নয়, এমনকি পুরো সরকারগুলোকেও তাদের ইচ্ছার অধীনস্থ করে তোলে।'' শিল্প, ব্যাঙ্ক ও সরকারের মধ্যে যে ত্রিমুখী ''ব্যক্তিগত সংযোগ'' রয়েছে সেটাও এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন পর্যায়কে বিশদে বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন লিখলেন ঃ

''পুঁজিবাদের বিকাশ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যখন আগের মতই পণ্যোৎপাদনের 'রাজত্ব' চললেও এবং সমগ্র অর্থনীতির বনিয়াদ বলে তা বিবেচিত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ঐ বনিয়াদকে দুর্বল করে তোলা হয়েছে এবং মুনাফার ব্যাপক অংশই চলে যাচ্ছে লগ্নি নিয়ে কারচুপির 'ওস্তাদদের' হাতে। এইসব কারচুপি ও ঠগবাজির মূলে রয়েছে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ, কিন্তু সামাজিকীকরণে পৌঁছতে মানবজাতি যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে তা উপকারে লাগছে ... ফাটকাবাজদের।'' উৎপাদিকা পুঁজির থেকে অর্থ পুঁজির এই পৃথকীকরণ তথা আধিপত্য বেড়ে চলতে থাকে। ফলস্বরূপ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ''আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন এক আর্থিক উপরিকাঠামো ... যা বিশ্ব অর্থনীতি ও তার বেশিরভাগ জাতীয় এককের মাথার ওপরে বসে আছে।'' অর্থাৎ বলা যায় এখন ''আর্থিক ও প্রকৃতর মধ্যে একটা বিপ্রতীপ সম্পর্ক'' থাকছে যেখানে ''আর্থিক সম্প্রসারণ দাঁড়িয়ে আছে এমন এক প্রকৃত অর্থনীতির ওপর, যা মোটেই স্বাস্থ্যবান নয় বরং বিকাশহীন।'' (পল সুইজি, ''লগ্নি পুঁজির বিজয়'' *মান্থলি রিভিউ*, জুন ১৯৯৪)

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে লগ্নি ক্ষেত্রের আপেক্ষিক ভার এইভাবে স্বচ্ছন্দগতিতে লাগাতার বাড়তে থাকল, কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে তা বেড়ে চলল চূড়ান্ত সামঞ্জস্যহীনভাবে। এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হল নয়া উদারবাদী বিনিয়ন্ত্রণ ও তথ্য বিপ্লব। এর মধ্যে আবার সব থেকে ব্যাপক আকারে ও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলা উপাদানটি হল ফাটকাবাজি ও অন্যান্য বেপরোয়া কার্যকলাপ ঃ ডেরিভেটিভ কেনা-বেচা, হেজফাণ্ডের কারবার, সাবপ্রাইম ঋণ ইত্যাদি।

ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার মার্টিন উলফ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যেন এক বিরাট হেজফাণ্ড হয়ে উঠেছে। লগ্নি কোম্পানিগুলোর মুনাফা সমস্ত কোম্পানির মোট মুনাফার পাঁচ শতাংশেরও কম ছিল ১৯৮২ সালে, কিন্তু ২০০৭ সালে তা বেড়ে ৪১ শতাংশে পৌঁছে যায়।'' ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্টস্ প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০০৭-এর ডিসেম্বরে ডেরিভেটিভ কেনা-বেচার মূল্য দাঁড়িয়েছিল ৫১৬ ট্রিলিয়ন ডলারে—যেটা ২০০২-এর ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ঐ পরিমাণে দাঁড়ায়।

অন্যভাবে বললে, এই ছায়া অর্থনীতি বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (৫০ ট্রিলিয়ন ডলার) বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বিশ্বের শেয়ার বাজারগুলোতে শেয়ার কেনা-বেচার প্রকৃত মূল্যের (১০০ ট্রিলিয়ন ডলার) পাঁচগুণেরও বেশি হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ডেরিভেটিভ কেনা-বেচা এবং সাধারণভাবে শেয়ার ও মুদ্রা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থ পুঁজির আত্মসম্প্রসারণ। মার্কস যেমন দেখিয়েছিলেন, কষ্টকর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হয়ে টাকা থেকে আরও টাকা করাটা বুর্জোয়াদের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই লালিত এক আদর্শ হয়ে থেকেছে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এই আদর্শকে অন্তত 'নিপুণভাবে' প্রয়োগ করা হয়েছে।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে, দ্রুত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে লগ্নিপত্র (ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস) নিয়ে ব্যবসাই হল ফাটকাবাজি। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ঝুঁকি কেনাবেচা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো শিল্পে লগ্নি সরবরাহ এবং ফাটকাবাজি দুটোই করে। বাস্তব জীবনে এই দুই বর্গ এইভাবে একই গোত্রের হয়ে ওঠে—কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপেই আলাদা। প্রথাগত ঋণ ও উৎপাদন-মুখী লগ্নি পুঁজি প্রকৃত অর্থনীতি, অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, পরিষেবার প্রয়োজন মেটায়, যেখানে সম্পদ উৎপন্ন হয় ও মানুষ কাজ পায়, আর ফাটকা পুঁজি কোন প্রকৃত সম্পদের সৃষ্টি করে না।

আমরা দেখেছি যে, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বড় বড় ব্যাঙ্কাররা ''অত্যাধিক অলীক ঋণ'' সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল এবং মার্কস ''মাত্রাছাড়া ফাটকাবাজি''র কথা বলেছিলেন। জন মেনার্ড কেইনস ১৯৩০-এর দশকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ''ফাটকাবাজরা উদ্যোগের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বুদবুদ মাত্র হয়ে থাকলে সেটা ক্ষতিকারক নয়। তবে উদ্যোগ যদি ফাটকাবাজির ঘূর্ণাবর্তে বুদবুদ হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেটা কিন্তু চিন্তার বিষয়। কোন দেশের পুঁজির বিকাশ যখন জুয়াখানার কার্যকলাপের উপজাত পদার্থ হয়ে ওঠে, তখন সেটা কিন্তু সত্যিই সমস্যা।'' ***(কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব)***

এই সমস্ত সতর্কীকরণের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ফাটকাবাজিকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে, কেননা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে ১৯৭০-এর দশকের পর মাথাচাড়া দেওয়া অতি উৎপাদন/অতি সঞ্চয়ের সংকট থেকে পরিত্রাণের অন্যতম বা সর্বাধিক আকর্ষণীয় রাস্তা। ১৯৯৭ সালে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় আমেরিকার রবার্ট মর্টন ও মাইরন স্কোলসকে, যাঁরা ''ডেরিভেটিভগুলোর'' দাম নির্ধারণের একটা মডেল-এর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ঐ মডেল বা প্রকরণটা ''বিজ্ঞানসম্মতভাবে'' ফাটকাবাজি করে নিরাপদে বিপুল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করবে বলে আশা করা গিয়েছিল। লংটার্ম ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট নামক হেজফাণ্ড যাতে মর্টন ও স্কোলস অংশীদার ছিলেন এবং যা পুরস্কৃত প্রকরণ অনুযায়ি কাজ করত—এক বছরের মধ্যেই তা দেউলিয়া হয়ে পড়ার উপক্রম হল। অবশ্য নিউ ইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

সুস্থ বিচারবুদ্ধির কোন মতামত যে শোনা যায়নি এমন নয়। ২০০০-এর দশকের প্রথম দিকে ওয়ারেন ই বুফেট বলেছিলেন, ডেরিভেটিভগুলো হল ''গণবিধ্বংসী আর্থিক অস্ত্র'' এবং ২০০৭-এর মার্চ মাসে অ্যালান গ্রীনস্প্যানকে উদ্ধৃত করে বেন বারনানকে সতর্ক করে বললেন, সরকারি উদ্যোগের সংস্থা ফ্যানি মে ও ফ্রেডি ম্যাক ''ব্যবস্থাপনাগত ঝুঁকি''-র উৎস হয়ে উঠেছে এবং সম্ভাব্য সংকটকে প্রতিহত করার জন্য সরকারকে আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিলেন। এরপর ২০০৮-এর শেষ দিকে জর্জ সোরস লিখলেন ঃ

''... বর্তমান সংকট এর আগের আর্থিক সংকটগুলো থেকে আলাদা। ... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন বুদবুদের ফেটে যাওয়াটা আর একটা বৃহত্তর ''অতিকায় বুদবুদ''-এর বিস্ফোরণের অনুঘটক রূপে কাজ করেছে, যেটা ১৯৮০-র দশক থেকেই ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল। অতিকায় বুদবুদটির ভিত্তি ছিল ক্রমেই বেশি-বেশি করে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা। ঋণ—তা সে উপভোক্তা বা ফাটকাবাজ বা ব্যাঙ্ক যাকেই দেওয়া হোক না কেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জি ডি পি-র তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বেড়ে চলেছিল। বৃদ্ধির এই গতি আরও বেড়ে চলল এবং তা বুদবুদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করল, যেটাকে জোরালো করে তুলল ১৯৮০-তে প্রাধান্য লাভ করা একটা ভ্রান্ত ধারণা, যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন রোনাল্ড রেগান আর গ্রেট ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। ...

''প্রান্তিক দেশগুলোর তুলনায় আমেরিকার আপেক্ষিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণে সে বাকি বিশ্বের সঞ্চয়কে শুষে নিতে পারল এবং চলতি খাতে সে তার ঘাটতিকে চালিয়ে যেতে থাকল যা ২০০৬-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৭ শতাংশে পৌঁছে যায়। ...'' তিনি এইভাবে দেখালেন, এর ফলেই অনিবার্যভাবে সংকট এসে আছড়ে পড়ল। (***সংকট ও তার মোকাবিলা***, দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৮)।

ফাটকাবাজ শিরোমণি অতএব চূড়ান্তমাত্রায় বিনিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ ও ঘাটতির ওপর নির্ভরশীলতাকে তিরস্কার করছেন।

যাই হোক, উপরিভাগের গাঁজলাটাকে তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তার উৎপত্তি তলাকার যে পরস্পর বিরোধী স্রোতের সংঘাত থেকে, সেটাকে তিনি দেখাতে পারেননি। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বুঝতে হলে আমাদের পুঁজির রচনাকারের কাছে যেতে হবে।

উপরিভাগের গাঁজলার নিচে কী আছে ঃ

সংকটের মূল কারণ সম্পর্কে মার্কস

এ বিষয়ে এগোনোর আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী সংকট নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে এক সামগ্রিক তত্ত্ব দাঁড় করানোর আগেই বিশ্বের সর্বহারার কাছ থেকে মার্কসকে বিদায় নিতে হয়। মার্কস ***পুঁজি***গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ***উদ্বৃত্ত মূল্য-র তত্ত্বসমূহ*** ও ***গ্রুনড্রিসে***-কে নিজের জীবদ্দশায় প্রকাশনার যোগ্য চূড়ান্ত রূপ দিয়ে যেতে পারেননি; পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধানের পরিকল্পনাকে কার্যকরি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই মার্কসের তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন ধারার ভিন্ন ভিন্ন মতের ব্যাখ্যা আছে। উদাহরণস্বরূপ—লুক্সেমবর্গ লেনিনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। পল সুইজি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালিয়েছিলেন আর্নেস্ট মণ্ডেল। অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিতর্ক, যা এখনও চলছে, তা নিয়ে পর্যালোচনার জায়গা এখানে নেই। পুঁজিবাদী সংকটকে অনুধাবনের জন্য আমরা যেটাকে বুনিয়াদি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বলে বুঝি, তার সংক্ষিপ্ততম রূপরেখাকেই আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি।

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে, ''গত বহু দশক ধরে শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস হল বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের যা মূল শর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরও বেশি করে বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তোলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। ... এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারী হাজির হয় যা এর আগের সমস্ত যুগে অসম্ভব বলে মনে হত----অতি উৎপাদনের মহামারী। সমাজ যেন সহসাই এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; ... কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবন ধারণের প্রভূত উপায় আবির্ভূত হয়েছে, অত্যাধিক মাত্রায় শিল্প হয়েছে, বাড়াবাড়ি মাত্রার বাণিজ্য দেখা দিয়েছে। ... এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপক অংশকে বাধ্যতামূলকভাবে ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে; অন্যদিকে, নতুন নতুন বাজার দখল করে এবং পুরনো বাজারগুলোকে আরও বেশি করে নিংড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ, ব্যাপকতর ও আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রশস্ত করে এবং সংকটকে প্রতিহত করার উপায়গুলোকে সংকুচিত করে তুলে।''

মার্কস ও এঙ্গেলস ''অতি উৎপাদনের মহামারী''র কথা বলছেন। এটা হল বাস্তব চাহিদার অনুপাতে পণ্যের অতি উৎপাদন ঃ যা বিক্রি করা যাবে তার চেয়ে অধিক মাত্রায় উৎপাদন। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে উৎপাদিত পণ্যের একটা বড় অংশ বিক্রি করা যায় না এবং তার মালিকদের (উৎপাদক/ব্যবসায়িদের) ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। পুঁজিবাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই মার্কস মন্তব্য করেছেন—''সমাজের চূড়ান্ত ভোগ ক্ষমতাই (যা ক্ষমতার থেকে আলাদা—অঃ সেন) উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সীমানা বলে ধরে নিয়ে উৎপাদিকা শক্তিকে লাগাতার বাড়িয়ে চলার পুঁজিবাদী প্রবণতার বিপরীতে জনগণের দারিদ্র ও সীমিত ভোগ—এখানেই রয়েছে সমস্ত সংকটের চূড়ান্ত কারণ।'' (***পুঁজি***, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৮৪)

এইভাবে, সমস্যাটা নিছক দাম উসুলের সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ ব্যবসার জগতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যতটা বিক্রি করা যাবে না তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করার মত মূর্খামিটা কেন করেন?

গভীরে গেলে আমরা দেখতে পাই সংকটটা পুঁজিপতিদের বোকামির জন্য ঘটে না, বা আকাশ থেকেও পড়ে না। সংকটগুলো তৈরি হয় কয়েকটি আংশিক স্বাধীন ও পরিবর্তনশীল উপাদানের জটিল আন্তক্রিয়া থেকে উদ্ভুত ব্যবসা/বাণিজ্যের চক্রের মধ্যে থেকে। এদের মধ্যে যে উপাদানটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল মুনাফার গড় হারের পরিবর্তনশীলতা। ***পুঁজি***গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অংশে মার্কস যেমন দেখিয়েছেন, দীর্ঘ মেয়াদে এবং সমগ্র অর্থনীতিতে এই হার পড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে তা ঘটে এইভাবে। (ক্রমশ)

পুঁজির জন্য দৌড়াদৌড়ি—এ ডি বি-র কাছে বশ্যতা

মমতা সরকার পশ্চিমবঙ্গকে গণরায় নির্ধারিত পরিবর্তনের দাবির আলোকে পুনরুজ্জীবিত করার নীতি-পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে এক স্থিতাবস্থার আবর্তে ফেলে রাখছে। আর কাজ করে দেখানোর প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই পেশ করছে তথাকথিত সাফল্যের কিছু পরিসংখ্যানগত কাগুজে হিসাব। কিন্তু যেহেতু তাতে ভাবমূর্তি নির্মাণের জন্য কাজের কাজ বিশেষ দিচ্ছে না, তাই একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিষয়টিকে তুলে ধরছে, অন্যদিকে 'উন্নয়ন ও শিল্পায়ন'-এর জন্য বিদেশী লগ্নি টানতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে।

মার্কিন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিলারি ক্লিন্টন মুখ্যমন্ত্রী মমতার সাথে সাক্ষাৎ করে যাওয়ার পরপরই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী আমেরিকা-ব্রিটেন সফরে যান। তিনি প্রথমে হাজির হন লাস ভেগাসে। সেখানে বৈঠকে মিলিত হন অনাবাসী বাঙালি বিনিয়োগ ক্ষমতা সম্পন্নদের সম্মেলনে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রীও ভিডিও সহযোগে ঐ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী তারপর ওয়াশিংটনেও গেছেন, সেখানে বৈঠক হয়েছিল ভারত-মার্কিন বাণিজ্য পরিষদের সঙ্গে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডা, সেখান থেকে ব্রিটেন, অর্থমন্ত্রীর লগ্নি টানার পরিক্রমা ছিল আমেরিকা থেকে ইউরোপ। ব্রিটেনে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য পরিষদের খোদ চেয়ারম্যান প্যাট্রিসিয়া হিউইন্ট-এর সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি আকর্ষণ করতেই ছিল ঐ বিদেশমুখী প্রয়াস। মার্কিন পত্রিকা 'টাইমস্' পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত মুখ্যমন্ত্রীকে তুলে ধরেছে, তৃণমূল সরকারও লগ্নী খুঁজতে মার্কিনমুখী হয়েছে। আরও খবর হল, এই উদ্যোগ দেখে ১৫টি আন্তর্জাতিক চরিত্রের সংস্থা লগ্নী পাইয়ে দেওয়ার 'লিঙ্ক'-এর ভূমিকায় থাকতে রাজী। এদের মধ্যে রয়েছে চার বড় দালাল বিশেষজ্ঞ সংস্থা—প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স, কে পি এম জি, ডিলয়েট এবং আর্নস্ট অ্যাণ্ড ইয়ং। এছাড়া রয়েছে আরও কিছু মাঝারি মাপের সংস্থা—ক্রিসিল, ফিডব্যাক ভেঞ্চার, অ্যাকসেনচার, রাইটস, আই ডি এফ সি। এদের দ্বারস্থ হওয়ার মূল কারণ হল, মমতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'পিপিপি' মডেলকে লগ্নীর মূল ভিত্তি করা এবং প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে পিপিপি মডেলে 'উন্নয়ন'-এর আওতায় নিয়ে আসা সত্ত্বেও, এই মডেলে বিনিয়োগ বিশেষ সাড়া মিলছে না, তাই সরকার ঝুঁকছে বেসরকারি ও বিদেশী পুঁজির কাছে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একচ্ছত্র সুযোগ আরও করে দিতে। মমতা সরকার মনস্থ করেছে ১৫টির মধ্যে আপাতত ৯টি সংস্থাকে সবুজ কার্পেট পেতে ডেকে আনবে। ইতিমধ্যে বণিকসভা 'অ্যাসোচেম' আবার রাজ্য সরকারের পুঁজির জন্য দৌড়ের ওপর প্রভাব ফেলতে একটা সমীক্ষা পেশ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে প্রত্যক্ষ বিদেশী লগ্নী টানার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এখনও পিছিয়ে। তৃণমূল এখন খুচরো পণ্যের ব্যবসায় যতটা এফ ডি আই-এর বিরোধিতার কথা বলছে তার চেয়ে অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই বহুগুণ এফ ডি আই-এর সপক্ষে। তার সাথে সাথে দেশীয় পুঁজির হাঙ্গর-কুমীরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশেষত মুম্বাইমুখী হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বলিউডের এক নায়ককে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ টানার শোভাবর্ধন করতে ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার করা হয়েছে। দেশের 'বাণিজ্য নগরী' থেকে পুঁজি টানার মূল উদ্দেশ্যটা নিউটাউনে অর্থতালুক নির্মাণ সহ সামগ্রিক উপনগরী নির্মাণ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। আন্তর্জাতিক 'উপদেষ্টা' সংস্থা ম্যাকেঞ্জির সমীক্ষা রিপোর্টে আর্থিক গুরুত্বের বিচারে বিশ্বের ৪৪০টি নগর শহরের মধ্যে (দিল্লী ও মুম্বাই সহ) কলকাতা রয়েছে। তৃণমূল সরকার এসব খুব ফলাও করে প্রচার করছে। বিনিয়োগের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে তথ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মজার কথা, এসব উদ্যোগের ব্যাপারে কিন্তু এই সরকারের সাথে তার 'পেছনে লাগা' ঘোর পুঁজি ও বাজারপন্থী সংবাদপত্রের দারুণ মিল।

তবে মমতা সরকার দেশী-বিদেশী পুঁজির জন্য উঠে-পড়ে লাগলেও আমেরিকা-ইউরোপ থেকে পুঁজি ধরে আনতে এখনও সক্ষম হয়নি।

এই সরকারের এব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম 'সাফল্য'টি এল অতি সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় সদর দপ্তর স্থিত এ ডি বি (এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক) থেকে। রাজ্য সরকার এ ডি বি থেকে ২,১৭৭ কোটি টাকা ঋণ ও ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা 'অনুদান' পেতে চলেছে। রাজ্য সরকার এই প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন যাবত পাশাপাশি চালিয়ে আসছিল। যে কথা জানা ছিল বলে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেও ছিলেন কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সময়ের ছাড় দিতে না পারলেও এ ডি বি-র থেকে ঋণ যদি পেতে চায় সেব্যাপারে মন্ত্রীপদে থাকা পর্যন্ত চাইলে সাহায্য করে যেতে পারেন। এখন মমতা সরকারের এ ডি বি ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কোন মধ্যস্থতাকারি হাত-যশ কাজ করেছিল কিনা সেরকম কোন খবর সংবাদজগতে প্রকাশিত হয়নি। তবে খবরে প্রকাশ, এ ডি বি ঋণ দিচ্ছে ১৫ বছরের মেয়াদে। ঋণ পেতে শুরু করার পর থেকে প্রথম ৩ বছর ঋণ পরিশোধ করতে হবে না, সেই সময়ের ছাড় (মোরাটোরিয়াম) থাকবে। পরবর্তী ১২ বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যার সুদের মাত্রা ধার্য হয়েছে বাৎসরিক ১.২ শতাংশ। চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ দাবি করছে, এই ঋণ-পুঁজি চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের উন্নয়ন তহবিলের নাকি ৮১ শতাংশ পূরণ করতে সহায়ক হবে! প্রসঙ্গত বর্তমান রাজ্য সরকারের কোষাগারের অবস্থা খুব সঙ্গীন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ে কেন্দ্রের কাছেই বিগত বামফ্রন্ট আমলে করে যাওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল যেখানে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা, সেটা সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাব হল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ মমতা আমলে কেন্দ্রর কাছে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ২৬ হাজার কোটি টাকা বা তার বেশী। রাজস্ব আয় যেখানে ২১/২২ হাজার কোটি টাকা, সেখানে কেন্দ্রকে সুদ গুণতে হয় নাকি ২৪/২৫ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া এই সরকার ইতিমধ্যে বেতনদান বাবদ কয়েকবার বাজার থেকেও ঋণ করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। যদিও বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে খরচের মোচ্ছব চালানোর টাকার সংস্থান কোথা থেকে হয়েছে তার কোন স্বচ্ছ হিসাব প্রকাশ করা হয়নি, হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের কোষাগারের ঘাটতি ও ঋণ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.১ ও ৪০ শতাংশ।

এ ডি বি চুক্তিতে দাবি করেছে, প্রদত্ত ঋণ-পুঁজিকে এমন সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে ঘাটতি ও ঋণাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা নিশ্চিত হতে পারে। এ ডি বি-র দিকনির্দেশ আপাতদৃষ্টিতে বেশ পরোপকারী মোহ বিস্তারের মতোই। রাজ্য সরকারও এ ডি বি-কে মান্যতা দিয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিতে আরও নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি শর্ত চাপানো হয়েছে যে, কর আদায় ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সহ স্বাস্থ্য-শিক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে কড়া সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে। কর আদায় ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করার মধ্যে উপর্যুপরি নানা কর বৃদ্ধি ও আরোপের আশংকা থেকেই যাচ্ছে। বলা হয়েছে, সরকারি বেতনদান পদ্ধতিগতভাবে কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হবে। বহু নাকি 'ভূয়ো' শিক্ষকের নামে বেতন গুনতে হচ্ছে, সেসব তথ্যপ্রমাণ সহ ছেঁটে ফেলতেই নেওয়া হবে নয়া পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও শঙ্কা জাগে, এমনিতেই যেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষক ঘাটতি যথেষ্ট, তার পাশাপাশি, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অস্থায়ী ও পার্শ্ব শিক্ষকরা যথাক্রমে স্থায়ীকরণ ও পূর্ণ সময়ের নিয়োগ পাওয়ার প্রশ্নে আজও বঞ্চনার শিকার, এই পরিস্থিতিতে কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে 'ভূয়ো শিক্ষক' বার করার নামে প্রকৃত শিক্ষকদের বেতনদানের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার শঙ্কা থাকছে। যে গন্ডগোলটি বি পি এল তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে খুব স্বেচ্ছাচারিতার সাথেই করা হয়ে আসছে সেটা এরপর শিক্ষক তালিকার সুলুকসন্ধান করার নামে শুরু হয়ে যেতে পারে। এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আর, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে যে সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়ার শর্ত চাপানো হয়েছে তার ফলে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা-সংস্থান-এর ব্যাপক ছাঁটাই হওয়ার বিপদ ঘনিয়ে আসবে। এ ডি বি-র চুক্তিতে ঋণদানের পাশাপাশি যে 'অনুদান' দেওয়া হয়েছে সেটাও সংস্কার কার্যকরি করার শর্তসাপেক্ষে। এছাড়া চুক্তিতে উল্লেখ করা রয়েছে, শর্তমাফিক সমস্ত সংস্কার কার্যকরি করার ব্যাপারে তত্ত্বাবধানের শীর্ষে থাকবেন এ ডি বি-র একজন অর্থনীতিবিদ। মোদ্দা ব্যাপার হল, ঋণগ্রহীতার ওপর ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা থাকবে ঋণদাতার—এই বশ্যতা মেনে নেওয়া হয়েছে। এভাবে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্বাভিমান ফেরী করা সরকার এক এশীয় আর্ন্তজাতিক লগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে স্পষ্ট আত্মসর্মপণ করল। কিন্তু এই চুক্তির মাশুল গুনতে যেহেতু রাজ্যের জনগণকে বাধ্য হওয়ার বিপদ থাকবে, তাই রাজ্য সরকারকে জনগণের পক্ষে হানিকর ও অবমাননাকর এই চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রত্যাহার করা উচিত। অথচ মমতা সরকার চলছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে।

লক্ষ্ণৌতে আসন্ন বিপ্লবী যুব এ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন

(সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রচারিত প্রচারপত্রের অংশবিশেষ)

দুর্নীতির পাহাড় চূড়োয় দাঁড়িয়ে থাকা মনমোহন সিং-সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার তার দ্বিতীয় দফার মধ্যপর্ব অতিক্রম করার বর্তমান মুহূর্তে সংস্কারের নামে আম আদমির নিত্যদিনের জীবনযাত্রার ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পেট্রোপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি থেকে সরে এসে দফায় দফায় পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানো যদি সেচ-সার কৃষির উৎপাদন ব্যয় সহ সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির রাস্তাকে প্রশস্ত করে দিয়ে থাকে, তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের হেঁসেল পর্যন্ত এই যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে রান্নার গ্যাসে ব্যাপক ভর্তুকি ছাঁটাই নীতি। সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রাখার মতো মারাত্মক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে এই সরকার—তাও আবার সুকৌশলে সংসদকে এড়িয়েই। খুচরো ব্যবসায় একচেটিয়া বিদেশী পুঁজিকে দেওয়া হয়েছে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগের ছাড়পত্র, বিদেশী পুঁজির ছাড়পত্র মিলেছে বিমান পরিবহনেও। পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বীমা ক্ষেত্রেও বিদেশী লগ্নিকে ছাড়পত্র দিতে তৎপর সরকার। বিলগ্নীকরণের নামে লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলোকে জলের দরে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাকে। আর এসব অতি দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ তৈরি হয়েছে খোদ মার্কিন প্রভুর কাছ থেকে মনমোহন সিং-এর সমালোচনা আসার অব্যবহিত পর পরই।

নব্বই দশকের শুরুতে নব্য উদার অর্থনীতির পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দু-দশকের মধ্যেই দুর্নীতির সংখ্যা ও অঙ্ক—দুটোই স্বাধীনতার পরের চল্লিশ বছরের দুর্নীতির সামগ্রিক পরিসংখ্যানকে বিশাল মাত্রায় ছাপিয়ে গেছে। আর এটা প্রমাণ করে দিয়েছে এইসব দুর্নীতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ভারতের আর্থিক উদার নীতির সঙ্গেই তা যুক্ত, যার পরিসর বিভিন্ন শাসক দল, তার কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা, বিচারব্যবস্থা এবং সেনাবাহিনী পর্যন্ত বহুধা বিস্তৃত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শাসক দলগুলোর রাজনীতি ও কর্পোরেট তহবিলের আলিঙ্গন ক্রমশ বেড়েছে। কর্পোরেটদের টাকা রাজনীতিবিদের পরিবারকে ঘুষ হিসেবে দেওয়া হয়, আর সেই ঘুষের কালো টাকা পরিবারের মাধ্যমেই সাদা হয়। সম্প্রতি রিয়েল এস্টেট জায়ান্ট ডি এল এফ এবং গান্ধী পরিবারের জামাতা রবার্ট বঢরার আঁতাত সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাবলীতে এই বিষয়টি আরেকবার সামনে এসেছে।

কর্পোরেটদের বিপুল টাকা যে সুবিধাজনক রিপোর্ট বা সুপারিশের জন্যই শুধু কাজে লাগে তা নয়, এ দিয়ে এমনকী বিচারপতিদেরও প্রভাবিত করা যায়।

এই কর্পোরেট স্বার্থ যেখানেই আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে সেখানেই ভারতরাষ্ট্র তার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মোড়কটুকুকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় নেমে পড়ছে। প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেশের মধ্যাঞ্চলে আদিবাসীদের জমি দখল হচ্ছে। সেই জমির নিচের খনিজ সম্পদকে দেশী বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় যে কোন প্রতিরোধকে 'মাওবাদী রাষ্ট্রদ্রোহিতা' হিসেবে দেখিয়ে প্রতিবাদী আদিবাসী জনগণের ওপর নামিয়ে আনা হচ্ছে কোবরা, গ্রে হাউণ্ড, আধা সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ, অপারেশন গ্রীণ হান্ট। ইউ এ পি এ-র মতো দানবীয় কালাকানুন চাপিয়ে বিনা বিচারে দিনের পর দিন কারারুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে গণআন্দোলনের কর্মীদেরও। দেশের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারীর অদূরে কুড়ানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মৎস্যজীবী, নাগরিক আন্দোলনের কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন দেশবিরোধী শক্তির মদত। আর এই অজুহাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নামানো হচ্ছে ব্যাপক সন্ত্রাস। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে উত্তরের কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আফস্পার মত কালাকানুনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা দেশের অন্যত্রও এখন লক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম যুবকদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে নির্যাতন করা হচ্ছে, যার দৃষ্টান্ত আমরা বাটলা হাউস সহ নানা ঘটনার ক্ষেত্রে দেখছি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘বাংলাদেশী’ অতিকথা এবং আসামের হিংসাত্মক ঘটনাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঔপনিবেশিক নীতি এবং কৃষক অভিগমন

১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা আসাম দখল করে নেওয়ার পর থেকে পূর্বতন পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালি মুসলমান কৃষকদের আসামে আগমন ঘটতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত ব্রিটিশদের জনবিরোধী ঔপনিবেশিক নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তার শিল্পী/কারিগররা ও কৃষকরা হতদরিদ্র হয়ে পড়ে। জমিদারি ব্যবস্থায় ভয়ঙ্কর শোষণের ফলে তাদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। ভৌগলিকভাবে লাগোয়া আসামপ্রদেশে জনঘনত্ব কম ছিল, প্রচুর জমি ছিল এবং সেখানে কোন জমিদারি প্রথা ছিল না। দারিদ্র-জর্জরিত ও অত্যাচারিত বাঙালি মুসলমান কৃষকদের সামনে এটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা যে তারা ব্রিটিশদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ধীরে ধীরে অভিগমন শুরু করে দেয় ও পরে তা প্রবাহে পরিণত হয়। এর ফলে তাদের (ব্রিটিশদের) স্বার্থসিদ্ধি হয়—ব্যাপক সংখ্যক বাঙালিদের সেখানকার খালি জমিতে বসতি করিয়ে জমির খাজনা বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ঘাটতি প্রদেশে সহজেই সস্তা শ্রমিক সুলভ করা। শুরুতে, অসমীয়া ভূস্বামী সম্প্রদায় সস্তা শ্রমের জন্য আগমনকারীদের স্বাগতই জানায়।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ এই অবিরাম অনুপ্রবেশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯২০ সালে ক্ষতিগ্রস্ত নওগাঁও ও কামরূপ জেলায় এক ‘‘লাইন ব্যবস্থা’’ চালু হয় যাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের দখলে থাকা জমিতে একটা সীমার ওপরে অনুপ্রবেশকারিদের বসতি স্থাপন সীমাবদ্ধ করা হয়। এইভাবে তৎকালীন অবিভক্ত নওগাঁও, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় দেশভাগ ও স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দশকের পর দশক ধরে অভিগমনকারী বাঙালি মুসলমান কৃষকরা বিশাল পরিমাণ জমিতে বসতি স্থাপন করে।

প্রতিটি ধারাবাহিক অভিগমনকারী গ্রুপের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাদের নির্বিচারে বিস্তার হওয়া ঠেকাতে নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বসতির জন্য গুণমানযুক্ত জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসে। অনেককেই জংলা নীচু জমিতে এবং ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদীগুলোতে ব্যাপক বন্যার ফলে বারে বারে পরিবর্তিত চর বা চাপোরিগুলোতে বসতি স্থাপন করতে হয়। এইখানেই তাদের বংশধরদের এক বড় শতাংশ ১০০ বছর পরেও এখনো বসবাস করে যাচ্ছে। প্রতি বছর বন্যার কৃপায় নিয়মিতভাবে চরগুলো পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এবং ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখানদীগুলো কর্তৃক প্রতিনিয়ত জমির ভাঙনের ফলে এই জেলাগুলোতে মূল অভিবাসী মুসলমান জনগণের একটা বড় শতাংশ নিয়মিতভাবে গৃহহীন হয়ে চলেছে। জীবিকার সন্ধানে তারা প্রায়শই শহর ও নগরগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে নির্মাণ শ্রমিক, সব্জি বিক্রেতা বা রিক্সাচালক হিসাবে এবং শহরের বস্তিগুলোতে বসবাস করতে শুরু করছে, যা আবার শহরের বাবু সমাজের মনে বেআইনি বাংলাদেশী আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। ঐ শহরে মানুষদের না আছে তাদের প্রতি সহানুভূতি অথবা তাদের জীবনের বাস্তবতা তথা যেখান থেকে তারা চলে এসেছে সেই সমস্ত অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে কোন অন্তর্দৃষ্টি।

এইভাবে দেশভাগ ও স্বাধীনতা লাভের সময়ের মধ্যেই এক বড় সংখ্যক অভিবাসী বাঙালি মুসলমান জনগণ নওগাঁও, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলাগুলোতে এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সমধর্মীয় লোকজনের মধ্যে লুকিয়ে থাকার দাবিকে সংশয়ের চোখে দেখার একটি বাধ্যতামূলক কারণ হল এমনকি স্বাধীনতার সময়কালে এইসব জেলায় জনঘনত্ব যথেষ্ট বেশি থাকায় জমি ও জীবিকার যৎসামান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রতিযোগীতা অবশ্যম্ভাবীভাবেই অতি মাত্রায় তীব্র ছিল।

বর্তমানে আগমনকারীদের মধ্যে জমি নিয়ে সংঘর্ষ ও মামলা মোকদ্দমা ভুরিভুরি। কেন তারা মদত দেওয়া তো দূরে থাক লাগাতার বেআইনি অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করবে যেখানে তা তাদের নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকাকেই ধ্বংস করে দেবে?

যে সমস্ত অঞ্চলে বাঙালি মুসলমান অভিবাসীরা অনেককাল আগে থেকেই বসবাস করে আসছে সেই সব অঞ্চলে মুসলমানদের ঘনীভবন এই বাস্তবতাকেই দেখিয়ে দেয় যে তারা ঐ সমস্ত পূর্বোক্ত অভিবাসীদেরই বংশধর, আর তাই তারা আইনত ভারতীয় নাগরিক, বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী নয়, যেমন বলা হচ্ছে যে তারা এখনো এসেই চলেছে। এটা আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা জনগণনার তথ্য অনুযায়ী এইসব অঞ্চলে অসমীয়া ভাষী মানুষদের শতাংশের দিকে নজর দিই।

দেশভাগের সময় এক বড় সংখ্যায় বাঙালি মুসলমান অভিবাসী জনগণ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আসামেই থেকে যান। তাদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তাদের নিজেদের তরফ থেকে একটা সচেতন প্রচেষ্টা থেকেছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মাটির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার, প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে অসমীয়া ভাষাকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। পুরুষ পরম্পরায় অসমীয়া মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তারা সত্যিসত্যিই অসমীয়া ভাষাকে আপন বলে গ্রহণ করে নিয়েছে যা জনগণনার তথ্য থেকে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধুবড়ির জনসংখ্যার ৭৪.২৯ শতাংশ মুসলমানদের ৭০.০৭ শতাংশ অসমীয়া ভাষী। এর বিপরীতে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির মত জেলাগুলো হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বাংলাই প্রধান ভাষাগত পরিচয় হিসাবে রয়ে গিয়েছে। একই কালপর্যায়ে, অনেক স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় যারা একদা ‘অসমীয়া’-কেই উপর্যুপরি জনগণনায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিল তারা আবার তাদের জাতিগত ও ভাষাগত পরিচয়কে অসমীয়া বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছে।

তাই এরকম ধারণা করা সরলীকরণ হয়ে যাবে যে ব্যাপক বেআইনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ আজও ঘটে চলেছে, আর তার জন্য পছন্দমত জনগণনার তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিবর্তন ঘটে চলার পিছনে যে জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে তার প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হচ্ছে না।

কিভাবে ‘‘বহিরাগতরা’’
শোরগোলের বিষয় হয়ে উঠল

আসামে বহিরাগত ও স্থানীয় অধিবাসীরা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে এবং যদিও এমনকি জমিজমা নিয়েও কখনও কখনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তবুও তা ছিল সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ের আর কদাচিৎই তা জাতিগত বা সম্প্রদায়গত রক্তক্ষয়ী সংঘাতে পরিণত হয়েছে।

‘‘বেআইনি বাংলাদেশী বহিরাগত’’-রা চক্রান্ত করছে ‘স্থানীয় অধিবাসীদের ছাপিয়ে’ যাওয়ার জন্য—এই শোরগোল তোলার অনেক আগে বাঙালী হিন্দু বহিরাগতরা আসামে স্থানীয় অসমীয়াদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। সংঘর্ষ জমি নিয়ে ছিল না, কিন্তু বাস্তব অথবা কাল্পনিক ধারণা ছিল এই যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী চক্রান্ত করেছে স্থানীয় অসমীয়া জনগণের ওপর প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য। আর তা করছে উদীয়মান অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে যা অন্যথায় স্থানীয়দেরই প্রাপ্য ছিল। সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বাঙালি-আসামী দাঙ্গা হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিজাতরাই স্বাধীনতার পরবর্তী প্রায় তিন দশক ধরে আসামের রাজনীতিতে প্রভুত্ব কায়েম রেখেছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করেছে। কিন্তু ১৯৭০ নাগাদ তা পরিবর্তিত হতে শুরু করে যা স্পষ্ট হয় দিসপুরে পরের পর সরকারের রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে পড়া থেকে। সম্ভবত একটা লেফ্‌ট অফ দ্য সেন্টার বিকল্পের উদ্ভব হতে শুরু হয়েছিল এবং তার দিকে রাজ্যের স্থানীয় আদিবাসীদের এক বড় অংশ এবং পূর্ববাংলা থেকে আসা অভিবাসীরা, সম্প্রতি যারা ‘‘অক্সোমিয়া’’ পরিধির মধ্যে নতুন প্রবেশকারি (‘অক্সোমিয়া’ হল স্থানীয় শব্দ অর্থাৎ যাদের মাতৃভাষা অসমীয়া), তারা এখন এই বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল। এর খুব বেশীদিন পরের ব্যাপার নয়, যখন আসাম আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করল।

আসাম আন্দোলনের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিশ্লেষণে অধ্যাপক মনিরুল হুসেন তার সম্ভাবনাপূর্ণ রচনা, ‘আসাম আন্দোলন ঃ শ্রেণী, মতাদর্শ, পরিচয় (১৯৯৪)’-এ প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন যে বেআইনি বাংলাদেশী বহিরাগতদের বহিষ্কার ছিল ঐ আন্দোলনের লোক দেখানো ‘‘দৃশ্যমান’’ উদ্দেশ্য। আসল গোপন উদ্দেশ্য ছিল আসামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিজাতদের প্রতিনিধিত্বকারি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসাবে নতুন রাজনৈতিক মোর্চা গড়ে উঠছিল যেসব অংশের মধ্যে সেখানে মেরুকরণ করা।

তা ধীরে ধীরে কার্যকরিভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল প্রথমে এক শক্তিশালী প্রচারের মাধ্যমে ‘‘বাংলাদেশী বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী’’ ধূয়ো তুলে যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে ফেলবে—এইসব বলে তাদের জনমনে শয়তান বলে চিত্রিত করা হল এবং তারপর তাদের সমস্ত অধিকার ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হল।

বহিরাগতদের শয়তান হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটানো হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ অবিভক্ত নওগাঁও জেলায় ‘‘নেলী গণহত্যা’’।

এইভাবে, স্থানীয় অধিবাসী এবং বহিরাগতদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে এক অমেরামতযোগ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়, যার ফলে ‘বেআইনি অনুপ্রবেশ’ এই সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কোনরকম মতৈক্যে পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভিবাসী মুসলমান সম্প্রদায় এ ধরনের কোনরকম পদক্ষেপকেই সন্দেহের চোখে দেখে তাদের নাগরিকত্ব ও অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে। যে বিকল্প রাজনৈতিক মোর্চা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তা চিরকালের মত বিলীন হয়ে গেল।

আসাম চুক্তির পরবর্তীতে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এল তা সেই পুরোনো অসমীয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিজাতদেরই প্রতিনিধিত্বকারী। আর যে মন্ত্রীসভা গঠিত হল সেখানে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল আরও কম। মাত্র দেড় দশকের মধ্যেই এই সংগঠন নির্বাচকমণ্ডলীকে নিরাশ করে তুলল আর সেই পুরনো কংগ্রেসকেই উপর্যুপরি তিনবার ক্ষমতায় আসার পথ করে দিল, সর্বশেষের শাসনকালটি এখন চলছে।

(চলবে)

(লিবারেশন, অক্টোবর ২০১২)

আসন্ন ... যুব ... জাতীয় সম্মেলন

পাঁচের পাতার পর

দেশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে ভেতর ফাঁপা, রাংতায় মোড়া এক বকচ্ছপ সংস্কৃতি, যেখানে চিন্তা, বিশ্লেষণ ইত্যাদিকে ভিন গ্রহের বিষয় বলে মনে হয়। যুবসমাজের একটা বড় অংশকে এই সংস্কৃতি নিজের মাপমতন পণ্যারতি সর্বস্বতাকেই গড়ে নিচ্ছে। কল্পিত এক পাশ্চত্য সংস্কৃতির ‘হনুকরণ’-এর পাশাপাশিই আবার সামন্তী নিদর্শনগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্করভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গে বহু বিজ্ঞাপিত ‘পরিবর্তন’ ক্ষমতা বদলের দেড় বছরের মধ্যেই হোর্ডিং সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে। ‘দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চাই’—এই নির্বাচনী দেওয়াল লিখন হালকা হওয়ার আগেই স্কুল, কলেজ থেকে ধানজমি বা কারখানা—সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র, যুব, শ্রমিক ফ্রন্টের দাপাদাপি চোখে পড়ছে। অধ্যক্ষ থেকে শিক্ষকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, আর আক্রমণকারীরা এমনকী প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে মদত পাচ্ছে। একই ব্যাপার ঘটছে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোতে। মুখ্যমন্ত্রী বিচারের আগেই এগুলোকে সংবাদপত্রের একাংশের বানিয়ে তোলা চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করে দিচ্ছেন। সত্য প্রকাশ করে দিলে তদন্তকারী অফিসারকে বদলির শাস্তি পেতে হচ্ছে। কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকেও একইভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে। সার বীজ-এর মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি, ফসল সংগ্রহের অব্যবস্থা যে গ্রামীণ জীবনে নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে, তা প্রশাসন বা শাসক দল স্বীকার করতেই রাজী নয়। জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদের ঘটনাও ব্যাপকভাবে ঘটছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার দেশ-রাজ্য-সমাজের কোনও বিষয়ে ভিন্নমত ও প্রতিবাদের অধিকারকে রাজ্য সরকার ও তার প্রধান বিন্দুমাত্র জায়গা দিতে রাজী নন। বিরোধী দলগুলোকে মিছিল-মিটিং-ধর্মঘট এমনকী জমায়েতের অনুমতি পর্যন্ত প্রশাসন দিতে রাজী নয়, অথচ শাসক দলের জন্য নির্লজ্জভাবে ভিন্ন নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে। খুচরো ব্যবসায়ে এফ ডি আই-এর অনুমতি বা পেট্রোপণ্যে মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা ও সেই সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারই যে ‘মানুষের জন্য রাজনীতির’ একমাত্র বা প্রধান সূচক নয়, তা রাজ্যের জনগণ, বিশেষত যুবসমাজ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ও নির্লজ্জ মিথ্যা দাবিতে ক্রমেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন।

যুবসমাজের জীবিকার মৌলিক অধিকার বা মর্যদাপূর্ণ কাজের দাবি স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও অধরা থেকে গেছে। বরং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, মজুরিহ্রাস, ঠিকাপ্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। শহর শহরতলীতে ন্যূনতম বেতনের বিপুল আধা বেকার বাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেশের মানুষের জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র কৃষি দীর্ঘকালীন বৃদ্ধিহার ও ঋণাত্মক কর্মসংস্থানের সূচক নিয়ে গ্রামীণ জীবন, বিশেষত সেখানকার যুবসমাজের সঙ্কটকে আকাশস্পর্শী করে তুলেছে।

যুব সমাজের লড়াই এক অর্থে আগামী ও বর্তমান ভারতের লড়াই। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা, বিনয়-বাদল-দীনেশ সহ অগণিত বীরের উত্তরাধিকার বহন করে সারা দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক যুবসমাজের এক মহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ শহরে, আগামী ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০১২।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত

ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘‘আপডেট’’

গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

পাটনা ... রেকর্ড ভাঙ্গা জনস্রোত

একের পাতার পর

র‍্যালিকে দেখা-শোনা-বোঝার উৎসুক্য তৈরী হয়েছিল। বস্তুত তাঁরাও পার্টির আমন্ত্রণে উৎসাহভরে বড় সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিডিয়ার কাছেও পরস্পর বিপরীত অবস্থানের এই সমাবেশ দুটোকে তুলনা করার চমৎকার সুযোগ ছিল।

দু-আড়াই মাস যাবৎ এই সমাবেশের প্রস্তুতি চলছিল। নীতীশ কুমার নিজ র‍্যালির জন্য পার্টি, সরকার ও প্রশাসনের মধ্যকার সমস্ত বিভাজন তুলে দিয়েছিল এবং তাঁর পার্টির নেতা, বিধায়ক ও মন্ত্রীরা বৈধ-অবৈধ উপায়ে সঞ্চিত কোটি কোটি টাকা (কংগ্রেস বিধায়ক দলের নেতার কথামত কম করে ১০০ কোটি টাকা) খরচ করলেও জনসমাবেশে সেই মেজাজ তৈরী করতে পারেনি। সি পি আই (এম এল)-এর সব নেতা-কর্মীরা রাত-দিন ধরে জনগণের সাথে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের সমাবেশের উদ্দেশ্য বুঝিয়েছেন এবং বিহারকে বিকল্প ও সত্যিকারের জনমুখী বিকাশের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করেন। গ্রাম বৈঠকের ওপর সর্বাধিক জোর দিয়ে গ্রামে-গ্রামে পদযাত্রা, বড় এলাকাজুড়ে দেওয়াল লিখন এবং হাটে-বাজারে ছোট ছোট মিছিল ও পথসভা জন-সংযোগ ও প্রচারের মুখ্য রূপ ছিল।

শাসক পার্টির র‍্যালির ঠিক পরেই সি পি আই (এম এল)-এর সমাবেশ দিল্লীর ছাত্রদেরও আকর্ষণ করে—জে এন ইউ থেকে শাকিল অঞ্জুম, পীযুষ সহ অনেক ছাত্র র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিল।

মঞ্চে পার্টির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পলিটব্যুরো সদস্য স্বদেশ ভট্টাচার্য, কার্তিক পাল, ডি পি বক্সী, রামজী রাই; ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সম্পাদক জনার্দন প্রসাদ, উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সম্পাদক সুধাকর যাদব, পশ্চিমবঙ্গের অভিজিৎ মজুমদার, দিল্লীর প্রভাত কুমার, স্বপন মুখার্জী ও কবিতা কৃষ্ণান; ছত্তিশগড় থেকে রাজারাম, লোকযুদ্ধের সম্পাদক ব্রীজ বিহারী পাণ্ডে, বিহারে কর্মরত সব পলিটব্যুরো-কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য সহ সি পি আই-সি পি এম এবং সমাজবাদী নেতারা, সারা ভারত বাম সমন্বয়ের প্রতিনিধরা, ঝাড়খণ্ডের পার্টির বিধায়ক বিনোদ সিং এবং জে এন ইউ ছাত্র সংসদের মহাসচিব শাকিল অঞ্জুম ছাড়াও অন্য কিছু সম্মানীয় অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ বেদীতে পার্টি এবং বাম সমন্বয়ের নেতাদের মাল্যদানের পর জনসভা শুরু হয়। বিহার রাজ্য সম্পাদক কুনালের স্বাগত ভাষণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কে ডি যাদবের সভাপতি ভাষণের পর সভা শুরুর আগে সমগ্র সমাবেশ শহীদ স্মৃতিতে ২ মিনিট নীরবতা পালন করে। রাজ্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটি সদস্য এবং ভূতপূর্ব বিধায়ক অরুণ সিং সভা পরিচালনা করেন।

সভার প্রথমে বাইরে থেকে আসা অতিথিরা, জে এন ইউ ছাত্র সংসদের মহাসচিব শাকিল অঞ্জুম, বগোদরের (ঝাড়খণ্ড) সি পি আই (এম এল) বিধায়ক বিনোদ সিং, লাল নিশান পার্টি (লেনিনবাদী) মহারাষ্ট্রের সম্পাদক ভীমরাও বনসোড়, সি পি আর এম নেতা ও ভূতপূর্ব রাজ্যসভা সদস্য আর বি রাই, সি পি এম (পাঞ্জাব)-এর সম্পাদক মঙ্গতরাম পাসলা এবং এ আই সি সি টি ইউ-র সম্পাদক স্বপন মুখার্জী সমাবেশকে সম্বোধিত করেন। এরপর অ্যাপোয়া সম্পাদক মীনা তেওয়ারির পর বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিন্দ কেশরী যাদব, সমাজবাদী নেতা এবং ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবেন্দ্র যাদব, সি পি আই-এর রাজ্য সম্পাদক রাজেন্দ্র সিং এবং সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিজয়কান্ত ঠাকুর নিজেদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর সারা ভারত ক্ষেতমজুর সভার সর্বভারতীয় সম্পাদক রামেশ্বর প্রসাদ, সারা ভারত কিষাণ মহাসভার সম্পাদক রাজারাম সিং এবং ক্ষেতমজুর সভার সর্বভারতীয় সম্পাদক ধীরেন্দ্র ঝা সভাকে সম্বোধিত করেন। সবশেষে সি পি আই (এম এল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, গান্ধী ময়দানের এই সমাবেশ ঘোষণা করছে যে মনমোহন সিং হোক বা 'বিকাশ পুরুষ', 'সুশাসনবাবু' নীতীশ, দুজনেরই শেষের শুরু হয়ে গেছে। নীতীশের লুট ও ঝুটের উন্মোচন করতে গিয়ে শেষে তিনি বলেন যে বিকল্পের নির্মাণ হচ্ছে এবং নয়া ভারত ও নয়া বিহার, আলাদা আলাদা নয়, একসাথেই হচ্ছে। সবশেষে বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য অভ্যুদয় ৮ দফা প্রস্তাব পাঠ করেন যা সমাবেশ হাততালি দিয়ে সমর্থন করে। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর উদ্দীপ্ত শ্লোগানের সাথে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

বন্ধ হয়ে গেল মেটেলি চা বাগান

মেটেলি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল ৩১ অক্টোবর। লক্ষ্মী টি কোম্পানীর মালিকানাধীন এই বাগানে ম্যানেজার বিজয় সিং রাওয়াত ৩০ অক্টোবর রাতে গোপনে বাগান ছেড়ে পালিয়ে যান শুধুমাত্র ২৯ অক্টোবর এক প্রাক-লক আউটের নোটিশ দিয়ে। ম্যানেজার বাগানের চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চা গাছ কাটা এবং ম্যানেজার ঘটনাস্থলে গেলে তাঁর ওপর পাথর ছুড়ে হামলার ডাহা মিথ্যা অভিযোগ তোলেন। বাগান বন্ধের খবর পেয়ে অংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এ আই এস এ-র তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল বাগানে যায় এবং শ্রমিক-কর্মচারিদের সাথে কথা বলে। তারা জেনেছেন, বাগানের পরিস্থিতি সাধারণভাবে ভালই ছিল, বোনাস থেকে শুরু করে মাসিক ভাতা সবকিছু মোটামুটি পাচ্ছিলেন; কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ শীতকালে উৎপাদন কম হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে শ্রমিকদের পাওনা দেওয়া থেকে কেটে পড়তে চক্রান্ত করে বাগান বন্ধ করে দিতে চাইছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাগানের শ্রমিকরা বিগত বিজয়া দশমীর দিন অতিরিক্ত একদিনের ছুটি চেয়েছিলেন। মানেজার বলেছিলেন ছুটি অনুমোদিত হতে পারে, কিন্তু ছুটিটা মজুরিবিহীন হিসেবে ধরা হবে। শ্রমিকদের বক্তব্য ছিল, তারা কোন এক রবিবারে অতিরিক্ত কাজ করে দশমীর দিন কাজ না করার উৎপাদন ঘাটতি পুষিয়ে দেবেন। ম্যানেজার শ্রমিকদের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বরং ভয়ভীতি ও চাপা সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মানেজার লক আউটের নোটিশ জারী করেন ৩০ অক্টোবর, সেই নোটিশ বাগানে আসে ৩ নভেম্বর। নোটিশে কারণ দেখানো হয়, ম্যানেজার শ্রমিকদের দ্বারা 'আক্রান্ত' হয়েছিলেন। নোটিশের বয়ান অনুযায়ী 'আক্রান্ত' হওয়ার সময় দেখানো হয়েছে ৩০ অক্টোবর রাত। নোটিশের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে 'আক্রমণের ঘটনা' পুরোপুরি বানানো। এরপর দু-দুটি বৈঠক ম্যানেজার অসুস্থতার বাহানা দেখিয়ে এড়িয়ে গেছেন।

পাটনায় পরিবর্তন সমাবেশের আহ্বান ও গৃহীত প্রস্তাব

১। এই জনসমাবেশ কর্পোরেটগুলোর দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ সহ ইউ পি এ সরকারের অন্যান্য জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করছে। এই সমাবেশ এন ডি এ এবং তার শরিকগুলোর দ্বারা ছাত্র, পরিযায়ী শ্রমিক ও তথাকথিত 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ'-এর নামে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণকে এবং সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক উন্মাদনাকে উসকিয়ে তোলার প্রচেষ্টাকেও ধিক্কার জানাচ্ছে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে সেগুলোকে প্রতিরোধ করার অঙ্গীকার করছে। ইউ পি এ এবং এন ডি এ উভয়েরই জনবিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা ২০১৩-এর ২০-২১ ফেব্রুয়ারী সারা ভারত হরতালের প্রতি জোরদার সমর্থন জানানো এবং ঐ হরতালকে ভারত বন্‌ধে পরিণত করার আহ্বান এই সমাবেশ কৃষক, ছাত্র ও যুব, ছোট ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে রাখছে।

২। এই সমাবেশ বিহার সরকারের ঔদ্ধত্যকে এবং রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট দুর্বৃত্ত-পুলিশ গাঁটছড়ার হাতে ভাইয়ারাম যাদব ও ছোট্টু কুশওয়ার হত্যায় এবং পুলিশী নিপীড়নের বিভিন্ন ঘটনা ও তার সঙ্গে ফোরবেশগঞ্জ ও ঔরঙ্গাবাদ-এর গুলিচালনার ঘটনায় সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দিতে অস্বীকার করে চলাকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং এই সমস্ত ঘটনায় পুনরায় সি বি আই তদন্তের দাবি জানাচ্ছে। সম্প্রতি মধুবনি ও পারাইয়াতে পুলিশের পাশবিক গুলিচালনাও সরকারের স্বৈরাচারিতারই ফসল। এই সমাবেশ পরিবর্তনের জন্য লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করছে—যে পরিবর্তন নিপীড়নমূলক পুলিশী রাষ্ট্র গড়ে তোলার নীতীশ সরকারের প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে এবং নতুন বিহার গড়ার জন্য লড়াই করবে।

৩। বাথানিটোলা গণহত্যা মামলায় সমস্ত অভিযুক্তদের সাজাপ্রাপ্তিকে খালাস করে দিয়ে পাটনা হাইকোর্ট প্রদত্ত রায় হল বিচার বিভাগ সংঘটিত গণহত্যা। গোটা বিষয়টায় নীতীশ সরকারের ভূমিকা সন্দেহের মেঘে ঢাকা। আমাউসি গণহত্যা মামলায় অতি তড়িঘড়ি ও অন্যায়ভাবে মুসাহার সম্প্রদায়ের মানুষকে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বিহারে দলিত ও চরম পশ্চাদপদ সম্প্রদায়গুলোর বিরুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের ঘটে চলা ঘটনাগুলো আমাদের পুরনো দিনের কথাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। দলিত ও চূড়ান্ত পশ্চাদপদ সম্প্রদায়গুলোর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের পিছনে মূল কারণ হল সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রদত্ত সুরক্ষা। রণবীর সেনা প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং-এর হত্যার পর সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো যে সমস্ত দলিত ছাত্রের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়, তারা এখনও ন্যায়বিচার পায়নি ঃ পুনর্বাসন ও শিক্ষার সুরক্ষা থেকে তারা এখনও বঞ্চিত। দলিত-মহাদলিত-চূড়ান্ত পশ্চাদপদ ও দরিদ্র সম্প্রদায়গুলোর ন্যায়বিচার ও অধিকারের জন্য, এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার এই জনসমাবেশ করছে।

৪। মিথিলাঞ্চল-সীমাঞ্চল এলাকাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরীক্ষাগারে পরিণত করার বিজেপির প্রচেষ্টা এবং সন্ত্রাসবাদী ছাপ মেরে দিয়ে মুসলিম যুবকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলার একগুচ্ছ ঘটনার বিরোধিতা করে এই জনসমাবেশ সংখ্যালঘুদের জন্য সম অধিকার, সুরক্ষা ও মর্যাদার দাবি জানাচ্ছে।

৫। সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের ওপর সামন্ততান্ত্রিক হিংসা, গণধর্ষণ, অ্যাসিড ছোঁড়া ও অন্যান্য আক্রমণের ঘটনাগুলো ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে। সরকার ও প্রশাসনের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা দুর্বৃত্তদের সাহসকে বাড়িয়ে তুলছে। গণহত্যা যেমন লালু-রাবড়ি জমানার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, নারীদের গণধর্ষণ ও তাদের ওপর অন্যান্য আক্রমণ নীতীশ জমানার বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নারীদের ওপর হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের জবাব সরকার পুলিশী নিপীড়ন দিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মর্যাদা ও সমতার জন্য নারীদের সংগ্রামকে এই জনসমাবেশ সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছে এবং এই আন্দোলনগুলো চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

৬। এই সমাবেশ ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সরকারের মনোভাবকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং সমকাজে সমমজুরি ও নিয়মিতভাবে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। শিক্ষা—তা সে প্রাথমিক বা উচ্চ শিক্ষাই হোক—এক হতাশজনক অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘ ও জঙ্গী আন্দোলনের পর ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের কথা অবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের আসন্ন নির্বাচনগুলোতে দিল্লী ও পাটনার ছাত্র-বিরোধী শিক্ষা-বিরোধী সরকারগুলোকে পরাজিত করার আহ্বান এই সমাবেশ জানাচ্ছে।

৭। একদিকে বিহারের উন্নয়নের নামে কৃষকদের জমি জোরজবরদস্তি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ভূমি সংস্কার ও ভাগচাষীদের অধিকার সম্পর্কিত বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের সুপারিশগুলোকে হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগচাষীদের যেটুকু অধিকার রয়েছে, সেটাকে উল্টে দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। জমি জরিপের নামে জমিদাররা আবারও ভাগচাষী ও দরিদ্রদের জমি দখল করতে শুরু করেছে। এই সমাবেশ দাবি করছে, দরিদ্র-বিরোধী কৃষক-বিরোধী নীতিকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং আমূল ভূমি সংস্কার, কৃষক-ভিত্তিক শিল্প ও সেচ-এর প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে করতে হবে।

৮। বিহার সব সময়েই ক্ষমতাসীন শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করা ও সেগুলোতে দিশা প্রদানের ভূমিকার জন্য সুপরিচিত। ১৯৭৪-এর আন্দোলনে, ১৯৮০-র দশকের বোফর্স কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এবং ভাগলপুরে সাম্প্রদায়িক হিংসার রাজনীতিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে বিহার নেতৃত্বকারী ভূমিকা দিয়েছে; নেতৃত্বকারী ভূমিকা দিয়েছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুরক্ষায় এবং নতুন বিকল্প প্রদানে। ইউ পি এ এবং এন ডি এ-র বিরুদ্ধে বাম, গণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলনের শক্তিগুলোর শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলতে এবং বিহারে এক শক্তিশালী তৃতীয় বিকল্পের জন্য জাতীয় সংকটের এই মুহূর্ত বিহারের লড়াকু জনগণের কাছ থেকে এক যথাযোগ্য ভূমিকা ও নেতৃত্বের দাবি জানাচ্ছে।

স্কুল কমিটি নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচী

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত পুঁটিমাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক ও সাপ্টিবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কুল কমিটির নির্বাচনে তৃণমূলের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর পক্ষ থেকে ৭ নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয় স্থানীয় ধর্মপুর অঞ্চলের খদ্দির মাঠে। তারপর ৮ নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল করা হয় স্থানীয় রাজারহাটে। উপরোক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা কমিটি সদস্য শ্যামল ভৌমিক, রবীনাথ রায় ও অন্নদেব রায়। ৯ নভেম্বর ময়নাগুড়ি লোকাল কমিটির নেতৃত্বে কুড়াভান্ডার অঞ্চলের মল্লিকহাটে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। ঐ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন পার্টির জেলা কমিটি সদস্য ভাস্কর দত্ত ও শৈলেন রায়।

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

Regd. No. 53207/94 P.R. No. KOL RMS /105/2010-2012

দুবরাজপুর ... দ্বিতীয় সিঙ্গুর!

একের পাতার পর

হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ৫ জন গ্রামবাসীর আঘাতের চরিত্র (যা সিউড়ি সদর হাসপাতালে এই প্রতিনিধিদল চাক্ষুষ দেখে এসেছে) এবং সর্বোপরি গ্রামবাসীদের জবানবন্দী থেকেই এটা স্পষ্ট হয় যে 'পুলিশের সংযত থাকা বা গুলি না চালানোর' মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রামবাসীরা জানান যে, ৬ তারিখ ভোরবেলায় এক বিশাল পুলিশ বাহিনী, ৩৭টি রিকভরি ভ্যান নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রথমেই ধর্ণা মঞ্চে শুয়ে থাকা গ্রামবাসীদের ওপর যথেচ্ছ লাঠি চার্জ শুরু হয়। এই খবর চাউর হতে না হতেই, শয়ে শয়ে গ্রামবাসী আশপাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসে। কাকভোরে গ্রামবাসীদের এই বিশাল সংখ্যায় আগমন এবং প্রতিরোধ পুলিশের কাছে কিছুটা অপ্রত্যাশিতই ছিল। শুরু হয় বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ লড়াই। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলির মাঝখানে গ্রামবাসীরা তির-ধনুক নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। ঘটনাস্থলে ভাঙ্গচুর হয়ে পড়ে থাকা পুলিশ ভ্যান, চর্তুদিকে ছড়ানো অজস্র কাঁচের গুড়ো ঐ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সাক্ষ্য বহন করে চলে।

গ্রামবাসীরা জানান যে এমটা (ইস্টার্ণ মিনারেলস্ এ্যাণ্ড ট্রেডিং এজেন্সি), যা কয়লা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিগত মালিকাধীন সংস্থা, বিস্তীর্ণ অত্যন্ত উর্বর ১০টি গ্রামের ১১টি মৌজার অধীনে ৩ হাজার ৩৫৩ একর জমি অধিগ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। অত্যন্ত উর্বর তিন ফসলি এই জমিতে ধান ছাড়াও হরেকরকম সব্জি, সর্ষে চাষ হয়। ঐ অধিগৃহীত জমিতে ডিভিসি-র সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে খোলামুখ খনি তৈরী করতে এমটা বাম জমানায় ২০০৯-১০-এ প্রায় ৭০০ একর জমি হাতিয়ে নেয় বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে। ডিভিসি-র সঙ্গে নাকি একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়, যা সকলের কাছে অজানা। বহু বছর ধরে গ্রামবাসীরা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করছিল। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, নিছক জমির দাম নয়, জমির নীচে যে বিপুল কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটাও যেন জমির মূল্যের সঙ্গে ধরা হয়। ফেলারাম মণ্ডল জানান, এ বছর জুলাই মাসে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় লোবা গ্রামে তাঁদের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিরোধী মীমাংসার জন্য এক সপ্তাহের সময় দেন। কিন্তু, আজ পর্যন্ত তার ফয়সালা হল না।

গ্রামবাসীরা আরও জানান যে, ২০১১-র ডিসেম্বর মাসে এমটার লোকজন মাটি কাটার যন্ত্র নিয়ে এখানে উপস্থিত হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে এমটার লোকজন পালিয়ে যায়, আর তারপর থেকে ঐ মেশিনটি গ্রামবাসীদের হেফাজতেই রয়েছে। ধর্ণা মঞ্চের পাশেই ঐ মেশিনটাকে দেখা গেল। ঐ মেশিনটাকেই উদ্ধার করতে বিগত কয়েক মাস ধরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুলিশ-প্রশাসনের ওপর লাগাতার চাপ দিয়ে আসছিলেন।

গ্রামবাসীরা আরও জানান যে, জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এমটার দালাল হিসাবে এলাকায় কাজ করছে। বিঘে পিছু ২৫ হাজার টাকা কমিশন এমটার কাছ থেকে নিচ্ছে এই তৃণমূলী নেতা। আর পুলিশকে হামলা চালাতে সেই সরাসরি উস্কানি ও মদত দিয়েছিল। এটাও জানা গেল যে, এমটা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে।

আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের একটি প্রতিবাদী মিছিল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছানোর পর কার্তিক পাল তাঁদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি পুলিশী গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করে এই ঘটনাকে দ্বিতীয় সিঙ্গুর হিসাবে অভিহিত করেন। গ্রামবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর তদন্তকারী দলটি সিউড়ি সদর হাসপাতালে যায়। সেখানে গুলিবিদ্ধ ৫ জন গ্রামবাসীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করিয়েছে লোবার গ্রামবাসীরাই। হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দেখা করে আঘাতের চরিত্র সম্পর্কে জানতে চায় এই দলের প্রতিনিধিরা। বোঝাই গেল, উচ্চ মহলের চাপে সুপার পুরো বিষয়টাকেই 'অনুসন্ধান সাপেক্ষ' হিসাবে এড়িয়ে গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গ্রামবাসীরা হলেন—

(১) উপানন্দ মণ্ডল, বয়স-৪৫, বাঁ পেটে গুলির আঘাত।

(২) শ্যামল ঘোষ, বয়স-৩৫, বাঁ পায়ে গুলি চিহ্ন।

(৩) জীবন বাগদি, বয়স-১৯, ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, বাঁ দিকে কোমরের নীচে গুলির আঘাত।

(৪) পূর্ণিমা ডোম, বয়স-৩২, বাঁ পায়ে গুলির আঘাত,

(৫) বুদন ঘোষ, বয়স-৩৮, ডান হাতের তালুতে গুলির চিহ্ন।

তদন্তকারী দলের তরফ থেকে যে দাবিগুলো তোলা হয়েছে তা হল—(১) গুলি চালনার ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে (২) দোষী পুলিশ অফিসারদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। (৩) এমটা-ডিভিসি-র সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করতে হবে। (৪) সমস্ত আহত ব্যক্তিদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকারকে তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে। (৫) অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে এলাকা পরিদর্শনে যেতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গুলি চালনার ঘটনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এলাকা পরিদর্শনে গেলেও, ব্যতিক্রম একমাত্র তৃণমূল। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের কারুরই টিকি দেখতে পাওয়া যায়নি। বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় প্রথমে গুলি চালানোর ঘটনাকে স্বীকার করে তাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলেও পরবর্তীতে পুরোপুরি ডিগবাজী খেয়ে গুলি চালানোর বিষয়টাকে অস্বীকার করেন। পার্থ চ্যাটার্জী এই ঘটনার পেছনে প্রথমে 'সি পি এম-কংগ্রেসের' জড়িত থাকার অভিযোগ আনেন। ঠিক একদিন পর তিনি সেখানে 'বহিরাগত অতি বাম' শক্তির হদিশ খুঁজে পান। যদিও ''কৃষিজমি রক্ষা কমিটি''র নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীর ঐ অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে। দুবরাজপুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের মন্ত্রী-প্রশাসনের তরফ থেকে একের পর এক পরস্পর বিরোধী মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিতে আজ তৃণমূল নেতৃত্ব মরিয়া। তৃণমূলের প্রকৃত স্বরূপ আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের কাছে দ্রুতই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তাঁরা নতুন সংগ্রামের জন্য আবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এমটা—নাটকীয় উত্থানের নেপথ্যে

দুবরাজপুরের ঘটনা এমটা (ইস্টার্ণ মিনারেলস্ এ্যাণ্ড ট্রেডিং এজেন্সি)-কে তুলে আনল পাদপ্রদীপের আলোতে। নামটার মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে যে এটি এক ট্রেডিং সংস্থা। এই সংস্থার জন্মবৃত্তান্ত, বেড়ে ওঠার কাহিনী খুবই চমকপ্রদ। আরব্য রজনীর গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক।

উজ্জ্বল উপাধ্যায় ছিলেন কোল ইণ্ডিয়া ও 'সেল'-র এক চুনোপুঁটি বালি সরবরাহকারী কন্ট্রাক্টর। জ্যোতিবাবুর পুত্র চন্দন বসুর সঙ্গে ব্যবসায়িক গাঁটছড়া বাঁধার পর উজ্জ্বল উপাধ্যায় হাতে পেলেন আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ! বাম জমানার সাহচর্যে ও আশীর্বাদে যার বৃদ্ধি-বিকাশ অকল্পনীয় গতিতে। অলৌকিক পদ্ধতিতে। আর তাই, দু-দশকের মধ্যেই সেই বালি সরবরাহকারী 'এমটা' আজ ১৫০০ কোটি টাকার সম্পদের অধীশ্বর হয়ে উঠেছে। 'এমটা'র সহ-সভাপতি পুরোজিত রায় জানিয়েছেন যে, ২০১১-১২ সালের আর্থিক বছরে এই সংস্থার নীট মুনাফা ৫০ কোটি টাকা! বর্তমানে, এই সংস্থাটির কব্জায় দেশজুড়ে রয়েছে ১৭ কয়লা ব্লক, যাতে গচ্ছিত আছে ২.৫ বিলিয়ন টন কয়লা! ভারতবর্ষে কয়লার যে সম্পদ রয়েছে, কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও নবীন জিন্দালের পর তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা ভাণ্ডারের অধিকারী হচ্ছে এই সংস্থাটি।

১৯৯৪-৯৫ সালে, বাম সরকারের আমলে যখন শংকর সেন বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে যৌথ সেক্টর করতে এমটাকে রাজ্য সরকার মনোনীত করে। শিল্প মহলের পরিভাষায় এমটা নিছকই এক 'মাইন ডেভেলপার এ্যাণ্ড অপারেটর' (এম ডি ও)। কোল ইণ্ডিয়ার অন্যান্য এম ডি ও-রা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থার জন্য কয়লার খনন ও উত্তোলন করে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে এমটা এক 'ব্যতিক্রমী' সংস্থা। তারা রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থার জন্য সবকিছুই করে—জমি অধিগ্রহণের জন্য ছাড়পত্র জোগাড়, পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ এবং উত্তোলন। সেই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোর সঙ্গে এমটা গাঁটছড়া বাঁধে, যাদের না আছে পর্যাপ্ত মূলধন, না আছে খনন সম্পর্কিত পারদর্শিতা। এই ধরনের সংস্থাগুলোকেই এমটা কয়লা সরবরাহ করে।

বাম জমানায় একটি মাত্র রাজ্যে তার কারবার শুরু হয়। দ্রুতই, রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে সে অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ৫টি রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে তার যৌথ সেক্টর রয়েছে। সেগুলো হল—কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ। এছাড়া তিনটি আলাদা সরকারি সংস্থার সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। সেগুলো হল—তেনুঘাট বিদ্যুৎ নিগম, দুর্গাপুর প্রজেক্টস্ লিমিটেড এবং ডিভিসি।

উক্ত সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে এমটার সম্পর্কও সন্দেহজনক। প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে এমটার ৭৪ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। বাকি, ২৬ শতাংশ রাজ্য সংস্থাগুলোর। কোল মাইনস্ (ন্যাশনালাইজেশন) আইনের ৩(৩)(এ)(iii) ধারায় রাজ্য ভিত্তিক সংস্থাগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ২৬ শতাংশ ইক্যুইটি বজায় রাখার বিধান রয়েছে। কিন্তু, আইনে সিংহভাগ অংশীদারিত্ব রাখার নিষেধাজ্ঞা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, প্রতিটা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো ২৬ শতাংশের মধ্যেই নিজেদের বেঁধে রেখে দিয়েছে।

যে সমস্ত যৌথ সেক্টরের সঙ্গে এমটার চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তির বলে এমটা নির্দিষ্ট রাজ্যগুলোর জন্য বরাদ্দ ভবিষ্যতের খনি অধিকার পেয়ে যায়। স্বভাবতই, রাজ্যগুলোর জন্য বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ কয়লা ব্লকগুলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু রাজ্যগুলোর কাছে খনন সংক্রান্ত দক্ষতা বা পারদর্শিতা না থাকায় 'এমটা'র মতো 'অপারেটর'-র ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।

বিপুল সংখ্যক কর্মীর বেতন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করার জন্য কোল ইণ্ডিয়ার কয়লার দাম তুলনামূলকভাবে বেশী। কোল ইণ্ডিয়া থেকে কয়লা কিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে রাজ্যগুলোর বিদ্যুতের দাম অনেক বাড়বে। সে কারণে, এই সমস্ত 'কন্ট্রাক্টর' মারফত কয়লা উত্তোলন করে কম দামে রাজ্যগুলো কেনে, বিদ্যুতের দামকে কম রাখার জন্য। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে, এমটা কোল ইণ্ডিয়ার দামের সঙ্গে সামান্য ফারাক রেখেই কয়লা বিক্রি করছে। একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কর্ণাটক বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেড যদি এমটার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে অন্য কোন কন্ট্রাক্টর মারফত কয়লা কম দামে কিনত, তবে ২০১০-১১ সালে তার ১৩৫ কোটি টাকার সাশ্রয় হোত। হিসাবের নানা কারচুপি করে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে লাভের সামান্য অংশ দিয়ে এমটা আত্মসাৎ করছে বিপুল অর্থ।

বাম সরকারের স্নেহস্পর্শে পল্লবিত হয়ে ওঠা এমটা আজ রং-বেরঙের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত সরকারের সঙ্গে গভীর ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা বজায় রেখে চলেছে। এমটার লম্বা রাজনৈতিক হাত তাই সহজেই অনুমেয়। দুবরাজপুরের ঘটনা এবার দেখিয়ে দিল, এমটার সঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার ও তার মন্ত্রীদের দহরম-মহরম। আগামীদিনে হয়ত আরও অনেক কিছু উদ্‌ঘাটিত হবে।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹-২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com